জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ব্যবসায় উদ্যোগ

নবম-দশম শ্রেণি

রচনায়

ড. এ এইচ এম হাবিবুর রহমান
শেখ শাহবাজ রিয়াদ

সম্পাদনা

ড. এম এ মাননান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

কানিজ ফৌজিয়া খানম

কম্পিউটার কম্পোজ

কালার গ্রাফিক

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে : **বাংলা উন্নয়ন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন**, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।

প্রসঙ্গ–কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

ব্যবসায় ও উদ্যোগ পাঠ্যপুস্তকটি একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পরিমার্জিত কারিকুলামের আলোকে নবম-দশম শ্রেণির জন্য রচনা করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ শফিকুর রহমান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচীপত্র

অধ্যায়	অধ্যায় শিরোনাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম	ব্যবসায় পরিচিতি	০১-১১
দ্বিতীয়	ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা	১২-২২
তৃতীয়	আত্মকর্মসংস্থান	২৩-৩৫
চতুর্থ	মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়	৩৬-৬১
পঞ্চম	ব্যবসায়ের আইনগত দিক	৬১-৭০
ষষ্ঠ	ব্যবসায় পরিকল্পনা	৭১-৮০
সপ্তম	বাংলাদেশের শিল্প	৮১-৯১
অষ্টম	ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা	৯২-১০১
নবম	বিপনন	১০২-১১১
দশম	ব্যবসায় উদ্দোগ উন্নয়নে সহায়ক সেবা	১১২-১২০
একাদশ	ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব	১২১-১২৯
দ্বাদশ	সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয়	১৩০-১৪০

প্রথম অধ্যায়

ব্যবসায় পরিচিতি

Introduction to Business

ব্যবসায়ের উৎপত্তির মূলে ছিল মানুষের অভাববোধ। অভাব পূরণের লক্ষ্যেই মানুষ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপার্জন প্রচেষ্টায় জড়িত হয়। মূলত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও লেনদেনকে ঘিরেই উদ্ভব হয় ব্যবসায়ের। এ অধ্যায় থেকে আমরা ব্যবসায়ের ধারণা, উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ ও ব্যবসায়িক পরিবেশসহ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- ব্যবসায়ের ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যবসায়ের পরিধি, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যবসায়ের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- ব্যবসায়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব ।
- শিল্পের ধারণা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- বাণিজ্যের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- সেবার ধারণা ও প্রকারভেদ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- ব্যবসায়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশের উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে পারব।

ব্যবসায়ের ধারণা (Concept of Business)

ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক জনাব আসাদুজ্জামান নবম শ্রেণির ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের প্রথম ক্লাসে আসলেন। শিক্ষার্থীরা তাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাল। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি শিক্ষার্থীদের সকলের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে কে ব্যবসায়িক পরিবার থেকে এসেছ?' একজন শিক্ষার্থী বলল, তার বাবার চালের ব্যবসায় আছে। আরেকজন শিক্ষার্থী বলল, তার বাবার হাঁস-মুরগির খামার আছে। আরেকজন শিক্ষার্থী বলল, তার বাবার ঔষধের দোকান আছে। অন্য একজন শিক্ষার্থী বলল, তার মায়ের একটি বিউটি পার্লার আছে। শিক্ষক সকলের কথা মন দিয়ে শুনলেন এবং বললেন ধান-চাল, হাঁস-মুরগি ও ঔষধ বিক্রয় এবং বিউটি পার্লার পরিচালনা করা প্রত্যেকটি এক একটি অর্থনৈতিক কাজ। তোমাদের অভিভাবকদের সবগুলো অর্থনৈতিক কাজ ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে যদি তারা জীবিকা নির্বাহ ও মুনাফার আশায় উক্ত কাজগুলো করে থাকেন।

সাধারণভাবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় বলে। পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করা, হাঁস–মুরগি পালন করা, সবজি চাষ করাকে ব্যবসায় বলা যায় না। কিন্তু যখন কোনো কৃষক মুনাফার আশায় ধান চাষ করে বা সবজি ফলায় তা ব্যবসায় বলে গণ্য হবে। তবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যবসা বলে গণ্য হবে যদি সেগুলো দেশের আইনে বৈধ ও সঠিক উপায়ে পরিচালিত হয়।

ব্যবসায়ের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা একে অন্য সব পেশা থেকে আলাদা করেছে। ব্যবসায়ের সাথে জড়িত পণ্য বা সেবার অবশ্যই আর্থিক মূল্য থাকতে হবে। ব্যবসায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এর সাথে ঝুঁকির। মূলত মুনাফা অর্জনের আশাতেই ব্যবসায়ী অর্থ বিনিয়োগ করে । ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি অবশ্যই সেবার মনোভাব থাকতে হবে। ব্যবসায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এতে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়।

কর্মপত্র–১ : তোমাদের বাড়ি/ বিদ্যালয়ের আশেপাশে যে সকল ব্যবসায় চালু আছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত কর	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Evolution of Business)

দিনে দিনে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আওতাও বাড়তে থাকে। ফলে শুরু হয় পশু শিকার, খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পণ্য বিনিময়ের মতো কর্মকাণ্ড। কিন্তু পণ্য বা দ্রব্য বিনিময় করেও প্রয়োজন মেটানো যায় নি। ফলে দ্রব্য বিনিময়ের স্থলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা ও পরবর্তীকালে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়। ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের এ ধারাকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের ধারা

প্রাচীন যুগ	মধ্য যুগ	আধুনিক যুগ
• পশু শিকার • মৎস্য শিকার • ফলমূল আহরণ • কৃষিকার্য • দ্রব্য বিনিময়	• বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দুষ্প্রাপ্য শামুক, ঝিনুক, কড়ি ও পাথর ব্যবহার • বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রার ব্যবহার • কাগজি মুদ্রার প্রচলন • বাজার ও শহর সৃষ্টি • ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব	• শিল্প বিপ্লব • প্রযুক্তির উন্নয়ন • বিভিন্ন শিল্প কারখানার বিকাশ • বৃহদায়তন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রচলন • ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ • এটিএম কার্ড প্রচলন • মোবাইল ব্যাংকিং প্রচলন

ব্যবসায়ের আওতা ও প্রকারভেদ (Scope and Classification of Business)

বর্তমানে ব্যবসায় শুধু পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পণ্য-দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন, পণ্য-দ্রব্য বিনিময় ও এর সহায়ক কাজের সমষ্টিকে ব্যবসায় বলে। পণ্য-দ্রব্য বিনিময় সংক্রান্ত সহায়ক কাজে পরিবহন, বিমা, ব্যাংকিং, গুদামজাতকরণ ও বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক ব্যবসাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. শিল্প (Industry)

খ. বাণিজ্য (Commerce)

গ. প্রত্যক্ষ সেবা (Direct Services)

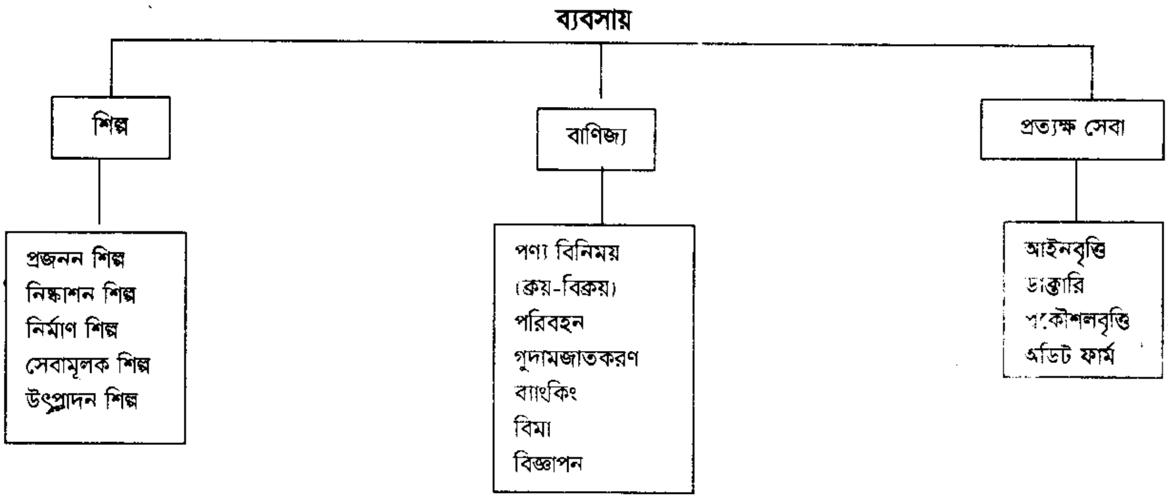

শিল্প (Industry)

শিল্পকে উৎপাদনের বাহন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, কাঁচামালে রূপদান এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁচামালকে মানুষের ব্যবহার-উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয় তাকে শিল্প বলা হয়। শিল্পকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- প্রজনন শিল্পে (Genetic) উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন- নার্সারি, হ্যাচারি ইত্যাদি।
- নিষ্কাশন (Extractive) শিল্পের মাধ্যমে ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু হতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয়। যেমন- খনিজ শিল্প।
- নির্মাণ (Construction) শিল্পের মাধ্যমে রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।
- উৎপাদন (Manufacturing) শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করা হয়। যেমন- বস্ত্র শিল্প।
- সেবা (Service) শিল্প বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও আরামদায়ক করে। যেমন- বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণ, ব্যাংকিং ও স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি।

কর্মপত্র–২ : বিভিন্ন প্রকার শিল্পের ৫টি করে উদাহরণ

প্রজনন শিল্প	নিষ্কাশন শিল্প	নির্মাণ শিল্প	উৎপাদন শিল্প	সেবামূলক শিল্প
১. নার্সারি	১. খনিজ শিল্প	১. রাস্তাঘাট নির্মাণ	১. বস্ত্র শিল্প	১. বিদ্যুৎ শিল্প
২.	২.	২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.	৫.	৫.

বাণিজ্য (Commerce)

বাণিজ্যকে ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবা সামগ্রী বণ্টনকারী শাখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌঁছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে। পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কার্য যথার্থভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থগত, ঝুঁকিগত, স্থানগত, কালগত ও তথ্যগত বাধা বা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সকল বাধা দূরীকরণে বাণিজ্যের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন পরিবহন, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং, বিমা, বিপণন ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যকে আধুনিককালে ব্যবসায় টু ব্যবসায় (Business to Business) বলেও অভিহিত করা হয়।

নিম্নে বাণিজ্যের বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা ছকে প্রদর্শন করা হলো–

বাণিজ্যের বিভিন্ন উপাদানের কাজ

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাধা	বাণিজ্যের উপাদান	ভূমিকা
স্বত্বগত	পণ্য বিনিময়	মালিকানাসংক্রান্ত বাধা দূর করে
স্থানগত	পরিবহন	স্থানগত বাধা দূর করে
সময়গত	গুদামজাতকরণ	সময়গত বাধা দূর করে
অর্থগত	ব্যাংকিং	অর্থ সংক্রান্ত বাধা দূর করে
ঝুঁকিগত	বিমা	ঝুঁকিসংক্রান্ত বাধা দূর করে
তথ্যগত	বিজ্ঞাপন	তথ্য ও প্রচার সংক্রান্ত বাধা দূর করে

প্রত্যক্ষ সেবা (Direct Services)

অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী প্রভৃতি পেশাজীবীরা বিভিন্ন রকম সেবাকর্ম অর্থের বিনিময়ে প্রদান করে থাকেন। এ সকল সেবাকর্ম বা বৃত্তি প্রত্যক্ষ সেবা হিসেবে পরিচিত। যেমন ডাক্তারি ক্লিনিক, আইন চেম্বার, প্রকৌশলী ফার্ম, অডিট ফার্ম ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ সেবা আধুনিক ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

ব্যবসায়ের গুরুত্ব (Importance of Business)

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য হলেও ব্যবসায় যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই গড়ে উঠেছে ছোট-বড় দোকান থেকে শুরু করে বিশাল শিল্প কারখানা। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আজকের পৃথিবীতে সে সকল দেশ উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে যে দেশগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত। ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সহজ হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। ব্যবসায়ের ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, মূলধন গঠিত হয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ের মাধ্যমে বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হয়। ব্যবসায় গবেষণা ও সৃজনশীল কাজের উন্নয়ন ঘটায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ফলে দেশে-দেশে পণ্য-দ্রব্যের আদান প্রদানের সাথে সাথে সংস্কৃতির বিনিময়ও ঘটে। ব্যবসায়-বাণিজ্যকে ঘিরে নতুন-নতুন শহর, বন্দর গড়ে উঠে।

এসএসসি পাস হালিমা অল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। দিনে দিনে তার প্রতিষ্ঠানটি এলাকার সফল ব্যবসায়ে পরিণত হয়। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন নারী-পুরুষ কাজ করে। কর্মচারীদের অধিকাংশ নদী ভাঙ্গানে ঘর-বাড়ি হারানো। শুরুতেই হালিমা তাদেরকে স্বল্প প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তারা সুঁই-সুতা দিয়ে নকশি আঁকা কাপড়, হাতের কাজের শাড়ি, থ্রি পিস, পাঞ্জাবি, ফতুয়া ইত্যাদি বিক্রি করে। হালিমা তার ব্যবসায় আরও বড় করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তিনি শহরে না গিয়ে চলে গেলেন গ্রামে। তার ইচ্ছা গ্রামের মহিলাদের কাজে লাগানো। দিনে দিনে তাদের গ্রামের অধিকাংশ মেয়ে তার ব্যবসায়ের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবন যাত্রার মানেরও উন্নতি হয়।

কর্মপত্র-১৮ : হালিমার ব্যবসায়ের কাহিনী পড়ে ব্যবসায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার যে ধারণা হলো তা লিখ-

ব্যবসায়ের গুরুত্ব
•
•
•
•
•

ব্যবসায় পরিবেশ (Business Environment)

পরিবেশ দ্বারা মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ব্যবসা প্রভাবিত হয়। পরিবেশ হলো কোনো অঞ্চলের জনগণের জীবনধারা ও অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদানের সমষ্টি। পারিপার্শ্বিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, পাহাড়, বনভূমি, জাতি, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদি। যে সব প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা ব্যবসায়িক সংগঠনের গঠন, কার্যাবলি, উন্নতি ও অবনতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে। কোনো স্থানের ব্যবসায়-ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপর।

পলাশ সার কারখানা, ঘোড়াশাল

বহু প্রকারের ব্যবসায়িক পরিবেশ দেখতে পাওয়া গেলেও ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলোকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural environment)
খ. অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic environment)
গ. রাজনৈতিক পরিবেশ (Political environment)
ঘ. সামাজিক পরিবেশ (Social environment)
ঙ. আইনগত পরিবেশ (Legal environment)
ঙ. প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technical environment)

ব্যবসায় পরিবেশ

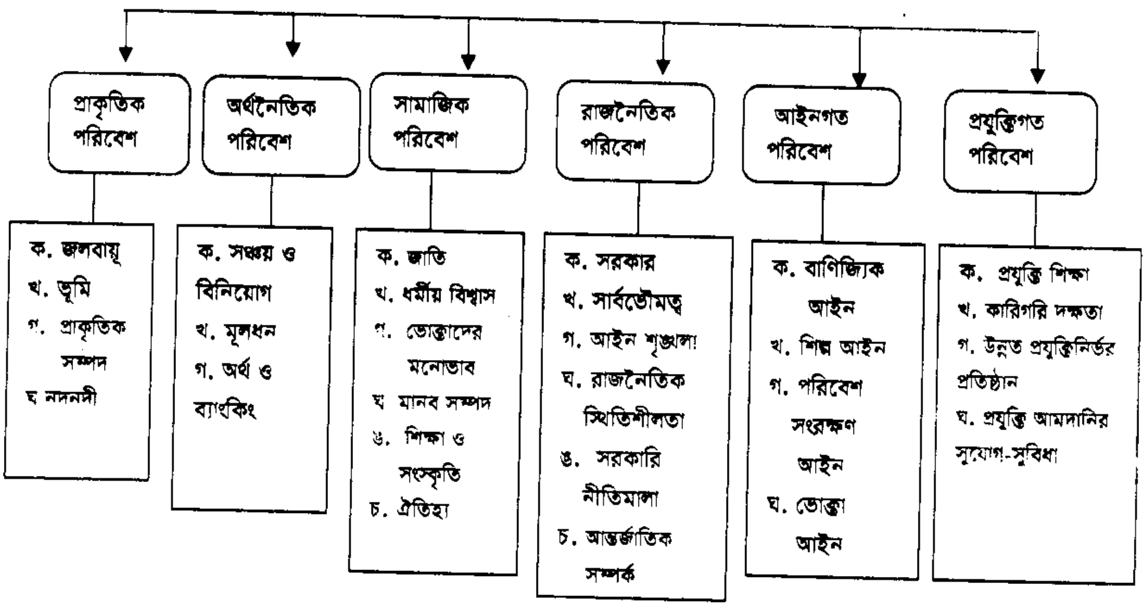

বাংলাদেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ (Business Environment in Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। অবশ্য দেশের অর্থনীতিতে ব্যবসায় তথা শিল্প ও বাণিজ্যের অবদান প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। এক কালে এ অঞ্চল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সারাবিশ্বে বিখ্যাত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে বিশেষ করে মসলিন কাপড়ের জন্য 'সোনারগাঁও' এবং সমুদ্র বন্দর ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য 'চট্টগ্রাম', এ দুটো স্থানের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সোনারগাঁও ও এর আশেপাশে তৈরি মসলিন রফতানি হতো ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে। আমাদের এ দেশ চিরকাল বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এ দেশের বাণিজ্যের খ্যাতিতে প্রলুব্ধ হয়ে আরবগণ স্মরণাতীত কাল পূর্বে থেকে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দলে দলে এদেশে আগমন করেন। বাণিজ্য বিষয়ে তখন এ অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি এতদূর হয়েছিল যে, ইতিহাস বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রামের সাথে এর ঘোর প্রতিযোগিতা চলত। এ অঞ্চলের বাণিজ্য খ্যাতি প্রাচ্যের দেশ ছাড়িয়ে সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। খ্রিস্ট্রীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা এসে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেন। তারা সপ্তগ্রামকে Porto Piqueno বা ক্ষুদ্র বন্দর এবং চট্টগ্রামকে Porto Grando বা বৃহৎ বন্দর নামে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য, বাণিজ্য বন্দর হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের সপ্তগ্রাম নামটিও বিখ্যাত ছিল। ভাগীরথী নদী ও সরস্বতী খালের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের সাথে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য চলত। সমুদ্র পথে ব্যবসায়ের জন্যও আমাদের দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। সমুদ্রগামী জাহাজও এ দেশে নির্মিত হতো। চৈনিক পরিব্রাজক মাহুয়ান লিখেছেন যে, এ দেশের জাহাজ নির্মাণ প্রণালির শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করে মহামান্য রোমের সম্রাট আলেকজান্দ্রিয়ার ডক কারখানা ও জাহাজ পছন্দ না করে চট্টগ্রাম থেকে জাহাজ তৈরি করে নিতেন। চট্টগ্রামের হালিশহর, পতেঙ্গায় দেশীয় শিল্পীর কর্তৃত্বে অনেকগুলো জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। ঐ সকল কারখানা তখন হাতুড়ির ঠক্‌ঠক শব্দে সবসময় মুখরিত থাকত। এ দেশের সওদাগরেরা তখন শতাধিক জাহাজের মালিক ছিলেন। ইতিহাসবিদ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের মতে, ঐ সকল জাহাজ নির্মাণ কারখানা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

সোনারগাঁও : বাংলার প্রাচীন রাজধানী ও বিখ্যাত ব্যবসায় কেন্দ্র

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ব্যবসায়িক পরিবেশের সকল উপাদান অনুকূল না হলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করে টিকে থাকা কঠিন। নিম্নে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হলো।

প্রাকৃতিক উপাদান : প্রাকৃতিক পরিবেশের অধিকাংশ উপাদানই বাংলাদেশে ব্যবসায় স্থাপনের জন্য অনুকূল। দেশের প্রায় সকল অংশই নদী বিধৌত। ফলে সহজেই এখানে কৃষিজাত বিভিন্ন শিল্প ও ভোগ্য পণ্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব। ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাস বিদ্যমান। দেশে বিদ্যমান খনিজ কয়লা, চুনা পাথর, কঠিন শিলা ও খনিজ তৈল শিল্প বিকাশে সহায়ক। দিন দিন বনভূমির পরিমাণ কমে গেলেও আমাদের রয়েছে সমৃদ্ধ বনজ সম্পদ। অসংখ্য নদী বিধৌত ও সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় মৎস্য শিল্প বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশও এখানে বিদ্যমান।

অর্থনৈতিক উপাদান : দেশে বিরাজমান কার্যকর অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পের অবদান, জনগণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ মানসিকতা ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবসায় পরিবেশের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর কয়েকটির ভিত্তি বেশ মজবুত হলেও অনেকগুলোর ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নয়। চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, গ্রামীণ জনগণের ব্যাংকিং সেবা ও ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শহরের তুলনায় কম সুবিধা, প্রশাসনিক জটিলতা, দালাল শ্রেণির লোকদের হয়রানি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থা কাটাতে পারলে বাংলাদেশ ব্যবসায় বিকাশে আরও দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে।

সামাজিক উপাদান : জাতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভোক্তাদের মনোভাব, মানব সম্পদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রভৃতি ব্যবসায়ের সামাজিক উপাদানগুলোর বেশিরভাগ বাংলাদেশে ব্যবসায় প্রসারের ক্ষেত্রে অনুকূল। এ দেশের মানুষ জাতিগত, ঐতিহ্যগত এবং সাংস্কৃতিকভাবে উদার, পরিশ্রমী এবং সৃজনশীল। অতীতে জাহাজ নির্মাণ করে এবং মসলিন কাপড় উৎপাদন করে এ দেশের মানুষ তাদের প্রতিভা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছে। সোনারগাঁও এক সময় ব্যবসায়, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, কারু শিল্পে ছিল বিশ্বসেরা। বর্তমানেও জামদানি শাড়ি তৈরি এবং জাহাজ নির্মাণ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুখস্থ নির্ভরতা থেকে বের করে আরও দক্ষতা ও শ্রমনির্ভর করতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিল্প, বাণিজ্য, গবেষণায় আরও বেশি সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারবে। সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

রাজনৈতিক উপাদান : সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অনুকূল শিল্প ও বাণিজ্যনীতি, প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন,

হরতাল, **ধর্মঘট**, ব্যবসায়-বান্ধব শিল্প ও বাণিজ্য নীতির অভাব ইত্যাদি প্রতিকূল রাজনৈতিক উপাদান শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীগণও বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় না। বাংলাদেশে ব্যবসায়ের উক্ত রাজনৈতিক উপাদানের সবগুলো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বিদ্যমান নেই। শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, হরতালসহ বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড পরিহার করার মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যবসায়ের জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নত করা যায়।

আইনগত উপাদানঃ আইনগত পরিবেশের বেশ কিছু উপাদান বাংলাদেশে আধুনিক ও যুগোপযোগী হলেও অনেকগুলো বেশ পুরাতন। পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভোক্তা আইনের কঠোর প্রয়োগ, শিল্প ও বিনিয়োগ বান্ধব আইন তৈরি এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধে আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা যায়।

প্রযুক্তিগত পরিবেশ : শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিতে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, যে সকল দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশে উন্নত তারা ব্যবসা-বাণিজ্যেও উন্নত। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। ফলে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে ব্যবসায় পরিবেশের প্রযুক্তিগত উপাদানগুলো অনেকক্ষেত্রেই অনুকূল। ব্যবসায়ের সকল শাখায় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্মপত্র- ৪ : তোমাদের এলাকায় পরিবেশের কোন কোন উপাদান ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল/প্রতিকূল মতামত দাও	
জলবায়ু	
বিদ্যুৎ	
ভূমি	
গ্যাস	
নদনদী	
ধর্মীয় বিশ্বাস	
ভোক্তাদের মনোভাব	
যোগাযোগ ব্যবস্থা	
শিক্ষা ও সংস্কৃতি	
ঐতিহ্য	
ব্যাংকিং সুবিধা	
আইন শৃঙ্খলা	

পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশগত উপাদানসমূহের উন্নয়ন খুবই জরুরি। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দুষ্প্রাপ্য শামুক ঝিনুকের ব্যবহার কোন যুগের বৈশিষ্ট্য?

ক. প্রাচীন খ. মধ্য

গ. মোগল ঘ. আধুনিক

২. কোন বন্দরকে Porto Grando নামে অভিহিত করা হতো?

ক. চট্টগ্রাম খ. খুলনা

গ. কলিকাতা ঘ. সপ্তগ্রাম

৩. বাণিজ্য ভোক্তাদের নিকট পণ্য পৌঁছাতে সহায়তা করে থাকে–

i. স্থানগত বাধা দূর করার মাধ্যমে

ii. সামাজিক সহায়তা দানের মাধ্যমে

iii. অর্থগত বাধা দূর করার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নের ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শাকিলাদের একটি পারিবারিক নার্সারি আছে। সেখানে তারা বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের চারা উৎপাদন করে বিক্রি করে। তাদের বাড়ির মাটি চারাগাছ উৎপাদন ও লালনের জন্যও উপযুক্ত। নার্সারিটি পুকুরের নিকট হওয়ায় পানিও সবসময় পাওয়া যায়। ফলে নার্সারির চারাগাছগুলোর মানও বেশ ভালো।

৪. শাকিলাদের নার্সারিটি কোন ধরনের শিল্প?

ক. উৎপাদন খ. প্রজনন

গ. সেবা ঘ. নির্মাণ

৫. শাকিলাদের নার্সারির চারাগাছগুলোর মান উন্নত হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ কোনটি?

ক. প্রাকৃতিক খ. সামাজিক

গ. অর্থনৈতিক ঘ. সাংস্কৃতিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আঁখিতারা গ্রামের দশম শ্রেণির ছাত্র নাফিসের বাবা গ্রামের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পল্লি চিকিৎসক। চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি মানসম্মত ঔষধও বিক্রি করেন। গ্রামে বিভিন্ন রোগের ঔষধের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি সব ধরনের ঔষধ ক্রয় করতে পারেন না। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে ঔষধ কোম্পানির এজেন্টরাও প্রয়োজনীয় ঔষধ সময়মতো পৌঁছাতে পারেন না। অন্যদিকে দোকানে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকায় অনেক ঔষধ নষ্ট হয়ে যায়।

ক. ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

খ. শিল্প বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দাও।

গ. নাফিসের বাবার ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নাফিসের বাবার পক্ষে এলাকাবাসীর চাহিদামাফিক ঔষধ সরবরাহ করতে না পারার প্রধান কারণ কোনটি বলে তুমি মনে কর। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. বাংলাদেশ একসময় ব্যবসা-বাণিজ্যে সারা বিশ্বে সুপরিচিত ছিল। এ দেশে এমন একটি বস্ত্র তৈরি হতো যার খ্যাতি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদীর আবহাওয়া ও জলীয়বাষ্প সে বিখ্যাত বস্ত্রটির সুতা তৈরিতে সহায়ক ছিল। সাথে ছিল শ্রমিক ও কারিগরদের আন্তরিক পরিশ্রম ও সৃজনশীলতা। বর্তমানে ব্যবসায়িক পরিবেশের সবগুলো উপাদানের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিক প্রসার ঘটবে এবং ফিরে আসবে অতীত গৌরব।

ক. কোন বস্ত্রের জন্য বাংলাদেশের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল?

খ. ব্যবসায়িক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. কোন পরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্দীপকে উল্লেখিত শ্রমিক ও কারিগরদের সৃজনশীলতা বিকাশ সম্ভব? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বর্তমানে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যবসায়ের কোন পরিবেশের উন্নয়ন জরুরী বলে তুমি মনে কর। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা

Business Entrepreneurship and Entrepreneur

সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ভিত্তি হচ্ছে উদ্যোক্তাদের সক্রিয় ভূমিকা। দেশে প্রাপ্ত সকল সম্পদ ও মানবসম্পদকে ব্যবহার করে এবং নিজেদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে তারা অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ অধ্যায়ে আমরা ব্যবসায় উদ্যোগের বিভিন্ন দিক, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব, সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি ও উদ্যোগ উন্নয়ন পথে বাধা দূরীকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- উদ্যোগের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি শনাক্ত করতে পারব।
- বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন পথে বাধাসমূহ দূরীকরণে করণীয়গুলো শনাক্ত করতে পারব।

উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগ (Entrepreneurship and Business Entrepreneurship)

তোমাদের বিদ্যালয়ে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্রতিবছর কোনো না কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। এবারের বিজয় দিবস আগত। তোমাদের মধ্য থেকে একজন প্রস্তাব দিল যে, এবার বিজয় দিবসে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা যেতে পারে। সে আরও বলল, নাটক আয়োজনে সবরকম সহযোগিতা সে করবে। নাটক আয়োজন একটি কষ্টসাধ্য ও সৃজনশীল কাজ। এ ক্ষেত্রে নাটক নির্বাচন, অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচন, স্থান ও সময় নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। এই যে তোমাদের ভিতর থেকে একজন শিক্ষার্থী নাটক আয়োজনে এগিয়ে এলো, এটি এক ধরনের উদ্যোগ। সাধারণ অর্থে যে কোনো কাজের কর্মপ্রচেষ্টাই উদ্যোগ। অতএব উদ্যোগ যে কোনো বিষয়েই হতে পারে।

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি এলাকার ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে এগিয়ে আসেন। তিনি নিজের সঞ্চিত অর্থ ও অন্যদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। এটি তার দৃঢ় মনোবল ও উদ্যোগ গ্রহণের ফসল। এভাবে সকল প্রকার জনহিতকর কাজ যেমন, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ও খেলাধুলার ক্লাব প্রতিষ্ঠা কারও কারও উদ্যোগের ফসল।

যে কোনো ব্যবসায়ও কোনো একজন ব্যক্তি বা কয়েকজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। একটি ব্যবসায় স্থাপনের ধারণা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে ব্যবসায়টি স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনাই ব্যাবসায় উদ্যোগ। বিশদভাবে বলতে গেলে, ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বোঝায় লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা।

আমিনুলের কাহিনী

জনাব আমিনুল ইসলাম ছোটবেলা থেকেই ভাবতেন নতুন কিছু করার। স্থানীয় কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করে তিনি তার পারিবারিক কাপড়ের ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এ ব্যবসায়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি তার বাড়ির কাছে মহাসড়ক সংলগ্ন বাজারে প্রতিদিন যেতেন। একদিন তিনি উপলব্ধি করলেন যে, বাজারটি মহাসড়কের পাশে হওয়ায় এখানে প্রায়ই যানবাহনগুলো ছোট-খাটো মেরামতের জন্য যাত্রা বিরতি করে। আমিনুল মেরামতের চাহিদা অনুধাবণ করে নিজের জমানো অর্থ এবং কিছু অর্থ ধার করে মূলধন গঠন করে একটি ওয়ার্কশপ স্থাপন করেন। কিন্তু যানবাহন মেরামত করার দক্ষতা তার না থাকায় স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এ বিষয়ে তিন মাসের প্রশিক্ষণ নেন। প্রথম দিকে ব্যবসায় থেকে তেমন আয় হয়নি। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম, দক্ষ সেবা ও সততার জন্য ধীরে ধীরে তার ব্যবসায়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং আয়ও বাড়তে থাকে। এ ব্যবসায় থেকে লাভবান হয়ে এখন তিনি এ ব্যবসায়ের সাথেই একটি পেট্রোল পাম্প স্থাপনের চিন্তা ভাবনা করছেন।

জনাব আমিনুল ইসলাম তার ইচ্ছা পূরণের জন্য ঝুঁকি নিয়েছেন এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে পরিশ্রম করেছেন। এই কর্ম প্রচেষ্টাই তার ব্যবসায় উদ্যোগ।

যে ব্যক্তি দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে ফলাফল অনিশ্চিত জেনেও ব্যবসায় স্থাপন করেন ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তিনি ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা। ব্যবসায় উদ্যোগ (Entrepreneurship) এবং ব্যবসায় উদ্যোক্তা (Entrepreneur) শব্দ দুটি একটি অন্যটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যিনি ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনিই ব্যবসায় উদ্যোক্তা। আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ড, জাপানের ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ম্যাটসুসিটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কনোকে ম্যাটসুসিটা পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পোদ্যোক্তা ছিলেন। বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পোদ্যোক্তা হলেন জহুরুল ইসলাম, রণদা প্রসাদ সাহা, জনাব আলী, স্যামসন এইচ চৌধুরী

প্রমুখ। বস্তুত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকই উদ্যোক্তা। দেশ-বিদেশের সকল ব্যবসায় উদ্যোক্তার জীবনী পাঠ করে দেখা যায় যে, তাদের অনেকেই প্রথম জীবনে ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন। দৃঢ় মনোবল, কঠোর অধ্যবসায় ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তারা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন।

উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Entrepreneurship and Business Entrepreneurship):

উদ্যোগ যে কোনো বিষয়ের ব্যাপারেই হতে পারে কিন্তু লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করাই হলো ব্যবসায় উদ্যোগ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মনে কর তুমি বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পার। এখন নতুন এক ধরনের বেতের চেয়ার দেখে সেটা বানানোর চেষ্টা করলে। এটি তোমার উদ্যোগ। এখন তুমি যদি অর্থ সংগ্রহ করে বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরির দোকান স্থাপন করে সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা কর, তখন এটি হবে ব্যবসায় উদ্যোগ। ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন কিন্তু অন্যান্য উদ্যোগের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ।

কর্মপত্র-১: নিম্নের কোনটি উদ্যোগ এবং কোনটি ব্যবসায় উদ্যোগ তা চিহ্নিত কর

১. বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন	
২. ফটোকপির দোকান স্থাপন ও পরিচালনা	
৩. খেলনা তৈরির ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা	
৪. বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখার চেষ্টা	
৫. চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বিক্রয়	
৬. ক্রিকেট খেলা আয়োজন ও পরিচালনা	
৭. জুয়েলারির ব্যবসায় পরিচালনা	
৮. বাড়ির আশেপাশে বৃক্ষ রোপণ	
৯. স্টিলের আসবাবপত্র তৈরির ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা	
১০. খাদ্যজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন	
১১. মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে কর্ম পরিচালনা	

ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য (Charecteristics of Business Entrepreneurship)

ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণা বিশ্লেষণ করলে যে সকল বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি লক্ষ করা যায় তা হলো :

১। এটি ব্যবসায় স্থাপনের কর্ম উদ্যোগ। ব্যবসায় স্থাপন সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড সফলভাবে পরিচালনা করতে ব্যবসায় উদ্যোগ সহায়তা করে।

২। ঝুঁকি আছে জেনেও লাভের আশায় ব্যবসায় পরিচালনা। ব্যবসায় উদ্যোগ সঠিকভাবে ঝুঁকি পরিমাপ করতে এবং পরিমিত ঝুঁকি নিতে সহায়তা করে।

৩। ব্যবসায় উদ্যোগের ফলাফল হলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এর মানে হলো ব্যবসায় উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা কোনো চিন্তা-ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়তা করে।

৪। ব্যবসায় উদ্যোগের অন্য একটি ফলাফল হলো একটি পণ্য বা সেবা।

৫। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালনা করা।

৬। নিজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তা নিজের উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৭। অন্যদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। ব্যবসায় উদ্যোগ মালিকের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন।

৮। নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে যেমন মানবসম্পদ উন্নয়ন হয় তেমনি মূলধনও গঠন হয়।

৯। সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। ব্যবসায় উদ্যোগ দেশের আয় বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে পারে।

১০। মুনাফার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ করা। ব্যবসায় উদ্যোগ উদ্যোক্তাদের সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে অণুপ্রাণিত করে।

ব্যবসায় উদ্যোক্তার গুণাবলি (Qualities of a Business Entrepreneur)

ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা থেকে উদ্যোক্তার গুণাবলি সম্পর্কে বেশ ধারণা লাভ করা যায়। অনেকে মনে করেন উদ্যোক্তাগণ জন্মগতভাবেই উদ্যোক্তা। অর্থাৎ জন্মসূত্রেই তিনি বহু ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী হন যা তাকে উদ্যোক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে সহায়তা করে। বর্তমান সময়ে অবশ্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যায়। একজন উদ্যোক্তার প্রধান প্রধান গুণসমূহ হলো–

• আত্মবিশ্বাস	• সৃজনশীলতা
• স্বাধীনচেতা মনোভাব	• উদ্ভাবনী শক্তি
• উদ্যম	• কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা
• সাংগঠনিক ক্ষমতা	• ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা
• সাহস	• নেতৃত্বদানের যোগ্যতা
• অধ্যবসায়	• পুঁজি সংগ্রহের ক্ষমতা
• সংবেদনশীলতা	• কৃতিত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা
• একাগ্রতা	• চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা
• নমনীয়তা	• ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা

সফল উদ্যোক্তাগণ দেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো চিহ্নিত করে তা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম। শিল্প উন্নয়নের জন্য সরকার প্রদত্ত সুযোগের ব্যবহারে তারা দক্ষতার পরিচয় দেন। তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সীমিত সম্পদের মধ্যে পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সফল উদ্যোক্তাগণ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে বাধাগুলো আগে থেকে অনুমান করেন এবং সেগুলো মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপখাইয়ে চলা এবং অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা সফল উদ্যোক্তার বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হয়। তারা ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিচক্ষণতার সাথে নিরূপণ করেন এবং তা এড়ানো বা কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ সফল উদ্যোক্তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলা এবং লক্ষ্য অর্জনে সমন্বয় সাধন উদ্যোক্তার বড় আরেকটি গুণ।

ব্যবসায় থেকে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের অনিশ্চয়তাকেই ব্যবসায়ের ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করা হয়। একজন সফল উদ্যোক্তা পূর্বেই ঝুঁকির সম্ভাব্য কারণ ও মাত্রা অনুমান করেন এবং সেগুলো মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সফল উদ্যোক্তা গতিশীল নেতৃত্ব গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন। সফল উদ্যোক্তা পুঁজি সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংস্থান ও তার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত ও জনসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে দক্ষতার পরিচয় দেন। ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে সফল উদ্যোক্তা গভীর জ্ঞান রাখেন। প্রচলিত প্রযুক্তির সাথে নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করা সম্পর্কে সফল উদ্যোক্তার ধারণা সময়োপযোগী। উদ্ভাবনী শক্তির বলে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার নতুন উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ এবং তা ব্যবহার করেন। তারা শিল্প উদ্যোগের নব নব দিগন্ত উন্মোচন করেন।

উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জমূলক কাজ করতে বিশেষ আনন্দ পান। ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনে নিরলস শ্রম দেন এবং ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস পরিহার করেন। তিনি নিজের ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তের প্রতি এত আস্থাশীল যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবিরাম কাজ করেন এবং ফলাফল অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত থাকেন। কোনো কারণে প্রথম বার ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ খুঁজে দ্বিতীয় বার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। কাজে সাফল্য অর্জনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রকৃত উদ্যোক্তারা নিজেদের ভুল অকপটে স্বীকার করেন এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং নিজের কর্মক্ষেত্রে সেই শিক্ষার প্রয়োগ উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ। সফল উদ্যোক্তা তাদের কাজের সাফল্যে পরিতৃপ্তি ও অসীম আনন্দ পান।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের অবদান (Contribution of Business Entrepreneurship in Economic Development)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়শীল দেশ। 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা–২০১০' অনুযায়ী আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৫০ ভাগ আসে সেবা খাত থেকে, প্রায় ২০ ভাগ আসে কৃষি খাত থেকে আর বাকি ৩০ ভাগ আসে শিল্প খাত থেকে। যে কোনো দেশের উন্নয়নে শিল্পখাত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্পখাতসহ সকল খাতেরই উন্নয়ন সম্ভব। ব্যবসায় উদ্যোগ নিম্নোক্তভাবে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে–

- **সম্পদের সঠিক ব্যবহার**

  ব্যবসায় উদ্যোগ আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে। নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

- **জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি**

  ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

- **নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি**

  সরকারের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমেও দেশে শিল্প কারখানা স্থাপন, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে নিত্যনতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় যা বেকার সমস্যা দূর করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

- **দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি**

  বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আমাদের এই বিশাল জনসংখ্যাই আমাদের সম্পদ হতে পারে। কারণ ব্যবসায় উদ্যোক্তা দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে পারে।

- **পরনির্ভরশীলতা দূরীকরণ**

  ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা আমাদের পরনির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস করতে পারি। ব্যবসায় উদ্যোগের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা একদিন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারব।

ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ (Favourable Environment for Developing Business Entrepreneurship)

আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাই যে, তাদের অগ্রগতির একটি প্রধান কারণ হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ। আমাদের দেশে মেধা, মনন ও দক্ষতার খুব বেশি ঘাটতি নেই। শুধুমাত্র অনুকূল পরিবেশের অভাবে আমাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার জন্য নিম্নোক্ত অনুকূল পরিবেশ থাকা উচিত–

- **উন্নত অবকাঠামোগত উপাদান**

  ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আনুষঙ্গিক কিছু সুযোগ সুবিধা, যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস ও যাতায়াত ব্যবস্থা দরকার। ব্যবসায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই সকল উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয়।

- **সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা**

  সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে দেশের ব্যবসায় উদ্যোগের আরও সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি সম্ভব। সরকারি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যেমন কর মওকুফ, স্বল্প বা বিনা সুদে মূলধন সরবরাহ ইত্যাদি ব্যবসায় উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে।

- **আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা**

  অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা যেমন ব্যবসায় উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, তেমনি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ব্যবসায় উদ্যোগের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

- **অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি**

  আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে ব্যাবসায় স্থাপন ও পরিচালনা সহজ হয়। অন্যদিকে অস্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে।

- **পর্যাপ্ত পুঁজির প্রাপ্যতা**

  যে কোনো ব্যবসায় উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি বা মূলধন। মূলধনের স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এজন্য দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে করে নতুন উদ্যোক্তারা পুঁজির যোগান পেতে পারে।

- **প্রশিক্ষণের সুযোগ**

  প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

কর্মপত্র–২ : তোমার এলাকায় ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নিচের কোন কোন **পরিবেশ অনুকূল এবং কোন** কোন পরিবেশ প্রতিকূল রয়েছে তা চিহ্নিত কর :

পরিবেশ	**অনুকূল/ প্রতিকূল**	**কারণ**
অবকাঠামোগত উপাদান		
সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা		
আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা		
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি		
পর্যাপ্ত পুঁজির প্রাপ্যতা		
প্রশিক্ষণের সুযোগ		
অন্যান্য		

ব্যবসায় উদ্যোগ ও ঝুঁকির সম্পর্ক (Relationship between Entreneurship and Risk)

ঢাকার রাপা প্লাজার ইশতা ফ্যাশন হাউজ-এর মালিক ইশতা আক্তার একজন সফল উদ্যোক্তা। এ ব্যবসায় থেকে তার যা আয় হয় তা থেকে তিনি তার পরিবারকে সহায়তা করেন এবং পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করেন। মূলত শখের বশে ব্যবসায় শুরু করলেও এখন এ ব্যবসায় থেকে তিনি ভালোই উপার্জন করেন।

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কেনাকাটার ছবি

কিন্তু মোবাইল ফোনের অনেক চাহিদা এবং লাভের সম্ভাবনা দেখে ভাবলেন যে ঐ ব্যবসায় শুরু করলে আরও অধিক লাভ করা সম্ভব। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে সতর্ক করলেন যে এ বিষয়ে তার যেহেতু কোনো জ্ঞান নেই, তাই এ ব্যবসায় বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু তিনি কারো কথা না শুনে ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন। এর সাথে নিজের বর্তমান ব্যবসায় থেকেও টাকা নিয়ে স্বল্পমূল্যে বিদেশ থেকে মোবাইল সেট আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অন্যদিকে ব্যবসায়ের প্রতিযোগীরা আরও কমদামে মোবাইল সেট আমদানি করল। তাতে তার অধিক পরিমাণ লোকসান হলো। তার এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো তিনি ঝুঁকির পরিমাণ বিবেচনা না করেই ব্যবসায় শুরু করেছেন।

ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে ঝুঁকির সম্পর্ক সর্বদা বিদ্যমান। কোনো ব্যবসায়ে ঝুঁকি কম, আবার কোনো ব্যবসায়ে ঝুঁকি বেশি। যে ব্যবসায়ে ঝুঁকি বেশি তাতে লাভের সম্ভাবনাও বেশি। আবার যে ব্যবসায় ঝুঁকি কম তাতে লাভের সম্ভাবনাও কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুদি দোকানে ঝুঁকি কম তাই মুনাফাও সীমিত। অন্যদিকে উপরে আলোচিত কেস স্টাডির মতো ব্যবসায়ে যেমন অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে তেমনি অত্যধিক ঝুঁকিও আছে ।

ব্যবসায়ে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। যে কোনো সময় উৎপাদিত পণ্যের অথবা সরবরাহকৃত সেবার চাহিদা কমে যেতে পারে। এর ফলে অর্জিত মুনাফা কমে যেতে পারে। এই সম্ভাবনাই ব্যবসায়িক ঝুঁকি। অন্যদিকে দেখা গেল ব্যবসায় থেকে বছরে উদ্যোক্তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা আশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে এর চেয়ে কম মুনাফা অর্জিত হয়েছে। এটিই হলো আর্থিক ঝুঁকি।

ব্যবসায় স্থাপন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। অন্যদিকে ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে অধিক পরিমাণ আয় করাও সম্ভব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একজন সফল উদ্যোক্তা সর্বদা ঝুঁকি আগেই নিরূপণ করেন এবং তা হ্রাসের ব্যবস্থা নেন এবং সবসময়ই পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করেন। মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকি এবং অতি আত্মবিশ্বাস যে কোনো পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে।

বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা (Obstacles to Entrepreneurship Development in Bangladesh)

বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বিরাজমান পরিবেশ সকল ক্ষেত্রে অনুকূল নয়। বেশ কিছু বাধার কারণে এখনো উদ্যোগ উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। নিম্নে বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধাগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

- **সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব** : উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন সম্ভব এমন পরিকল্পনা খুব প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের দেশে এ রকম ব্যাপক সুপরিকল্পনার অভাব রয়েছে।

- **চাকরির প্রতি অধিক আগ্রহ** : স্মরণাতীতকাল থেকে এ দেশের মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ফলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর তাদের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে চাকরির প্রতি অধিকভাবে আগ্রহী করে তোলে। ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে এটি অন্যতম একটি বাধা।

- **কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অপর্যাপ্ততা** : আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা মুখস্থনির্ভর ও তাত্ত্বিক শিক্ষাক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘদিন যাবত এ ব্যবস্থা চলে আসছে। পৃথক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এদিকে আগ্রহ কম। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতেও পারে না। ফলে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের অভ্যাস গড়ে উঠেনি।

- **প্রচার-প্রচারণার অভাব** : যে কোনো পদক্ষেপ বাস্তবায়নে প্রচার ও বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ সম্পর্কে যথেষ্ট ও কার্যকর প্রচার না থাকায় গ্রাম ও শহরের অনেক মেধাবী তরুণ-তরুণী, বেকার যুবশক্তি এ সম্পর্কে জানতে পারছে না। ফলে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি সার্থকতা লাভ করছে না।

- **প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের অভাব** : অনেকেই আছেন যারা উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধন ও অর্থের অভাবে এগিয়ে আসতে পারছেন না। অর্থসংস্থানের অপর্যাপ্ততা ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে অন্যতম বাধা।
- **প্রশিক্ষণের অভাব** : উদ্যোক্তা হওয়া অনেকটা জন্মগত হলেও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেক উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভাব রয়েছে।
- **রাজনৈতিক অস্থিরতা** : রাজনৈতিক অস্থিরতা যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয় ও ব্যবসায় কর্মকান্ড ব্যাহত হয়। ফলে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাগণ নতুন কিছু করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা দূরীকরণের উপায় (Ways to Overcome the Obstacles of Entrepreneurship Development in Bangladesh)

বাংলাদেশের ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে বিরাজমান বাধাসমূহ দূরীকরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে–

- কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে।
- উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ-পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন বিষয়টি ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারলে দেশের ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য নয়?

ক. আত্মবিশ্বাস
খ. উদ্ভাবনী ক্ষমতা
গ. পুঁজি সংগ্রহের দক্ষতা
ঘ. ঝুঁকি এড়ানোর মানসিকতা

২. ব্যবসায় উদ্যোগের প্রতি যুবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায়–

i. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে।
ii. গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে।
iii. এটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু করে।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii.
খ. i ও iii
গ. ii ও iii.
ঘ. i, ii ও iii.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

এনায়েত স্থানীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সে ও তার বড়ভাই মিলে পারিবারিক পুকুরে মৎস্য চাষ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কিছু বন্ধু-বান্ধব ঝুঁকির কথা বলে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। এতে তারা মোটেও থেমে যায়নি।

৩. এনায়েতদের মৎস্য চাষ শুরু করার কাজকে কী বলা যায়?

ক. উদ্যোগ
খ. ব্যবসায় উদ্যোগ
গ. ব্যবসায়
ঘ. শখ

৪. বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ না শুনে কাজে এগিয়ে যাওয়ায় এনায়েতের মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে–

ক. ধৈর্যশীলতা
খ. সাহসিকতা
গ. উদারতা
ঘ. চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মেহদাদ ও নুহাস দুই বন্ধু দশ বছর বিদেশে অবস্থান করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। তাদের আর বিদেশ যাবার ইচ্ছা নেই। মেহদাদদের এলাকা চিড়া-মুড়ি তৈরির জন্য বিখ্যাত। সে জন্য মেহদাদ গ্রামের দক্ষ কারিগরদের একত্রিত করে বৃহৎ আকারে মানসম্মত চিড়া-মুড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এতে মেহদাদের উন্নতির পাশাপাশি কারিগরদেরও সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেল। অন্যদিকে নুহাস গ্রামের ঐতিহ্যকে লালনের উদ্দেশ্যে তার নিজ বাড়িতে একটি পাঠাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলেন। এলাকাবাসী তাদের কর্মকাণ্ডে খুশি।

ক. ম্যাটসুসিটা কোন দেশের কোম্পানি?

খ. ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. নুহাসের গ্রামে পাঠাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা কোন ধরনের চিন্তা? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মেহদাদের উদ্যোগ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে'– উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. কাজল ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকে। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সে ছবি ও ব্যানার লিখে থাকে। তার নিখুঁত ও আকর্ষণীয় কাজ দেখে শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধব সবাই প্রশংসা করে। পরীক্ষার পর কাজল একটি এনজিওর অনুরোধে কিছু পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করে দেয়। এতে তার হাতে বেশ কিছু অর্থও আসে। তার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে বৃহৎ পরিসরে কাজল তার কর্মকে এগিয়ে নিতে পারছে না। কাজল স্বপ্ন দেখে একদিন তার 'কাজল আর্ট'-এর সুনাম ও পরিচিতি এলাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে।

ক. উদ্যোগের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

খ. উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য কী?

গ. উদ্দীপকের কাজলের মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কাজলদের মতো সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে দেশে বিশাল উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি করা সম্ভব। মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মকর্মসংস্থান

Self-employment

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আদমশুমারি ও গৃহ গণনা ২০১১-এর হিসাব অনুযায়ী, ২০১২ সালের ১৬ জুলাই দেশের অনুমিত লোক সংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ ১৮ হাজার ১৫ জন। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক রিভিউ ২০১১'-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অবদান ২০%, শিল্পখাতের ৩০% ও সেবাখাতের অবদান ৫০%। কিন্তু জনসংখ্যার দ্রুত হারে বৃদ্ধির প্রবণতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও চাহিদার তুলনায় কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগের জন্য দেশের বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন–২০১০-এর মতে, বাংলাদেশে মোট কর্মহীন লোকের সংখ্যা ২৬ লক্ষ। দেশের মোট শ্রম শক্তির পরিমাণ ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ, যাদের এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে যুবক-যুবতী। বিশাল কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরির মাধ্যমে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। প্রয়োজন আত্মকর্মসংস্থান। এ অধ্যায়ে আমরা আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারব।
- আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারব।

আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা (Concept of Self-employment)

করলা চাষে দারিদ্র্য জয় ভাণ্ডারিয়ার হাফিজের

এসএসসি পাস হাফিজুর রহমান ২০০০ সালে জাহাজে কাজ শুরু করেন। ছোট চাকরি, খাটুনি অনেক। কিন্তু বেতন অনেক কম। সংসার চলছিল না। বাধ্য হয়ে তাকে জাহাজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গ্রাম ফিরে আসতে হয়। ঔষধ কোম্পানিতে চাকরি নেয়ার অনেক চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হন। ডিগ্রি পাসের সনদ না থাকায় চাকরি মেলেনি। তবে পরিশ্রমী হাফিজুর দমে যাননি। বাড়ির আশপাশে পতিত জমি নিয়ে কিছু একটা করার কথা ভাবতে থাকেন। উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শে শুরু করেন পতিত জমিতে করলা চাষ। সপ্তাহে এখন তার ক্ষেতে ৭ মণ করলা ফলে। করলার আয় দিয়েই হাফিজুরের ছয় সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণ চলছে স্বাচ্ছন্দ্যে। পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ার মাটিভাঙ্গা গ্রামের শিক্ষিত চাষি হাফিজুর রহমান করলার পাশাপাশি নানা রকম সবজি আবাদ করে বেকারত্ব ঘুচিয়ে এখন স্বাবলম্বী, দারিদ্র্যকে করেছেন জয়।

হাফিজুর জানান, এবার তিনি ২ একর জমিতে নানা ধরনের সবজির আবাদ করেছেন। অর্ধেক জমিতে হাইব্রিড টিয়া প্রজাতির করলা চাষ করেছেন। অন্য জমিতে পুঁইশাক, বরবটি, কুমড়া, বেগুন, চিচিঙ্গা, ঢেঁড়সসহ নানা সবজির আবাদ করেছেন। প্রতিমণ ১২শ টাকা দরে স্থানীয় পাইকারদের কাছে তিনি করলা বিক্রি করে আসছেন। পাইকারি ক্রেতারা তার ক্ষেতে এসে করলা কিনছেন। এ বছর করলা বিক্রি করে তিনি প্রায় ৩ লাখ টাকা আয় করবেন বলে আশাবাদী। তবে করলা আবাদে ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। হাফিজুর একজন উদ্যমী কৃষক তাই সে সফল হয়েছে। এ ব্যাপারে কৃষি অফিসের নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার বলেন, হাফিজুরের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই সবজি আবাদে মনোনিবেশ করছেন। যে কোনো বেকার যুবকের জন্য বিষয়টি অনুকরণীয়।

এই যে জনাব হাফিজুর রহমান নিজের দক্ষতা ও গুণাবলি দ্বারা নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করেছেন এটাই আত্মকর্মসংস্থান। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্ম প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান একটি জনপ্রিয় পেশা। বিভিন্ন খুচরা বিক্রয়, রেডিও ও টেলিভিশন মেরামত, হাঁস-মুরগি পালন, মৌমাছি চাষ ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানের আওতাভুক্ত।

ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের সম্পর্ক খুব নিবিড়। আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের চিন্তা করে কাজে হাত দেন। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি তখনই একজন উদ্যোক্তায় পরিণত হবেন, যখন তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের আরও কয়েকজনের কর্মসংস্থানের চিন্তা নিয়ে কাজ শুরু করেন ঝুঁকি আছে জেনেও এগিয়ে যান এবং একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সে ক্ষেত্রে সকল ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে আত্মকর্মসংস্থানকারী বলা গেলেও সকল আত্মকর্মসংস্থানকারীকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলা যায় না।

কর্মপত্র ১ : তোমাদের স্কুল বা বাড়ির আশে পাশে দেখা যায় এমন ১০টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশার নাম খুঁজে বের কর	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	
১০.	

আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Self-employment)

নোয়াখালীর সানজিদা ইসলাম স্থানীয় কলেজ থেকে স্নাতক পাস করেও যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি লাভে ব্যর্থ হন। বেশ কিছু দিন বেকার থাকার পর তিনি স্থানীয় যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে ফুল চাষের উপর প্রশিক্ষণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রশিক্ষণ শেষে এক একর জমিতে ফুল চাষ করেন। প্রথম মৌসুমে তার আয় হলো ৫০ হাজার টাকা। লাভের টাকা পেয়ে তার আগ্রহ বহুগুণে বেড়ে গেল। এরপর তিনি ঢাকায় গিয়ে ফুল চাষের উপর দিনব্যাপী কর্মশালায় যোগ দিলেন ও পুষ্পমেলা ঘুরে দেখলেন। এখান থেকে তিনি নতুন দেশি বিদেশি জাতের ফুলের বীজ নিয়ে চাষ করে অনেক আয় করলেন। কঠোর পরিশ্রম আর সুযোগের সঠিক ব্যবহারের কারণে তার ব্যবসায় ৫ বছরে অনেক বড় আকার ধারণ করে। তিনি সম্প্রতি তার জেলার সেরা নারী উদ্যোক্তার পুরস্কার পান। পুরস্কার গ্রহণকালে তিনি আগত সবাইকে আত্মকর্মসংস্থানের নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করেন–

- কর্মসংস্থানকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়– মজুরি বা বেতনভিত্তিক চাকরি, আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায়।
- কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমজীবী ও চাকরিজীবী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কর্মসংস্থানের চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পায় সে হারে কর্মসংস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না।
- অন্যান্য পেশায় আয়ের সম্ভাবনা সীমিত। কিন্তু আত্মকর্মসংস্থান থেকে প্রাপ্ত আয় প্রথমদিকে সীমিত ও অনিশ্চিত হলেও পরবর্তীতে এ পেশা থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা অসীম।

- বর্তমানে আত্মকর্মসংস্থানের আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের তুলনায় বর্তমানে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন হলো নিজের দক্ষতা। কর্ম সম্পাদনের জন্য যে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল প্রয়োজন তার অর্থসংস্থান করাও অনেকটা সহজ।
- আত্মকর্মসংস্থান একটি স্বাধীন পেশা। আর এ ব্যবসায় যেহেতু অনেক সময় নিজের বাড়িতে বা জমিতে করা যায় সেহেতু আলাদা খরচ হয় না।
- আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত থাকলে তরুণ সমাজ নানা সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত না থেকে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় এখানে মজুরি অনেক কম। আবার আমাদের দেশে মৌসুমি বেকারত্বের সমস্যাও প্রকট। এসকল সমস্যা সমাধানে আত্মকর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।
- আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।
- আত্মকর্মসংস্থানের মানসিকতা যুবসমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এবং স্বেচ্ছামূলক কাজে উৎসাহিত করে।
- আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বয়স কোনো সমস্যা নয়। এর মাধ্যমে যে কোনো বয়সের মানুষ তার দক্ষতা অনুযায়ী অর্থ উপার্জন করতে পারে।

সানজিদা ইসলামের এ আলোচনা থেকে আত্মকর্মসংস্থানের কোন কোন গুরুত্ব তুমি অনুধাবন করতে পেরেছ? এছাড়াও আর যেসব কারণে আত্মকর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ বলে তোমার মনে হয় তা থেকে ৫টি কারণ নিম্নে লিখ :

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্র (Suitable and Profitable Areas of Self-employment in Socio-economic Context of Bangladesh)

আত্মকর্মসংস্থানের অনুপ্রেরণায় নিজ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় চালিত যে কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে যেমন সম্মানজনক জীবিকা উপার্জন করা যায়, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রাখা যায়। চাহিদা আছে এমন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে বা সেবাদান করে অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের যে সকল সম্পদ রয়েছে তার সঠিক ব্যবহার করে কীভাবে সম্মানজনক জীবিকা উপার্জন করা যায়। এ সব বিষয় বিশ্লেষণ করে আমরা আত্মকর্মসংস্থানের বেশ কিছু উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারি।

আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্র–

- হস্তচালিত তাঁত
- মাদুর বা ম্যাট তৈরি
- মৃৎশিল্প
- বাঁশজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ
- লবণ উৎপাদন
- টেইলারিং
- পোশাক প্রস্তুতকরণ
- মাছের জাল তৈরি
- কাঠের আসবাবপত্র তৈরি
- স্টিলের আসবাবপত্র তৈরি
- মাটির বাসন প্রস্তুতকরণ
- কামারের কাজ
- সেরিকালচার
- নৌকা তৈরি
- মাছ শুকানো
- গোল আলুর ময়দা তৈরি
- পাটের ম্যাট তৈরি
- আলুর চিপস তৈরি
- গৃহস্থালির দ্রব্যাদি তৈরি
- বাইসাইকেল মেরামত
- খেলনা তৈরি
- রাবারের দ্রব্য ও বল তৈরি
- রাবার চাষ
- মাখন তৈরি
- বলপেন ও কলম তৈরি
- ধানের খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ
- কনক্রিট বণ্টন
- পিনস্ তৈরি
- বাইসাইকেল নির্মাণ
- সবজি চাষ
- পিকস্ এন্ড প্যাড পিনস্ তৈরি
- গবাদি পশু ও হাঁসমুরগির খামার
- বেতের সামগ্রী তৈরি
- কাঁচের তৈজসপত্র তৈরি
- পাট তৈরি
- পিতল ও কাঁসার দ্রব্যাদি প্রস্তুত
- পাটের শৌখিন দ্রব্যাদি তৈরি
- গেঞ্জি তৈরি
- চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন
- ঝিনুক দ্রব্যাদি প্রস্তুত
- বেকারি
- আটা ময়দা প্রস্তুত
- ভোজ্য তেল উৎপাদন
- খাদ্যজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন
- নিটিং দ্রব্য প্রস্তুত
- এমব্রয়ডারি
- সুতা কাটা
- কাঠের খেলার সরঞ্জাম তৈরি
- প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং
- প্লাস্টিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত
- তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ
- মোমের দ্রব্যাদি তৈরি
- জুয়েলারি
- ম্যাকস্
- পিঠা তৈরি
- কর্নফ্লেকস তৈরি
- কাঠের ও বাঁশের টুথ পিক তৈরি
- আইসক্রিম চামচ তৈরি
- প্যাড প্রেসার
- কৃষি সরঞ্জাম প্রস্তুত
- ফটো ফ্রেম তৈরি
- ফেব্রিকেটেড মেটাল প্রডাকশন
- ফটোস্ট্যাট ব্যবসায়

উপরে উল্লিখিত ক্ষেত্র থেকে তোমার পছন্দের ১০টি ক্ষেত্র ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ কর :

১		৬	
২		৭	
৩		৮	
৪		৯	
৫		১০	

স্বনিয়োজিত পেশা গ্রহণের পূর্বে লক্ষ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া

আত্মবিশ্লেষন প্রক্রিয়া হিসাবে আত্মকর্মসংস্থান বেছে নেওয়ার পূর্বে নিজের লক্ষ্য যথাযথভাবে নির্ধারণ করা আবশ্যক। লক্ষ্য নির্ধারণে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করা প্রয়োজন :

তোমার দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য কী? কীভাবে তুমি তা অর্জন করতে চাও?
কোন নির্দিষ্ট তারিখে এ লক্ষ্য অর্জন করতে চাও?
তোমার স্বল্প মেয়াদি লক্ষ্য কী?
স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?
তা অর্জন করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছ কি?
লক্ষ্য অর্জনে কী কী বাধা থাকতে পারে?
বাধাগুলো কীভাবে অতিক্রম করবে?
সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তোমার পরিকল্পনা কী?
সমস্যা সমাধানের জন্য কী কী সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে?
সাহায্যকারী হিসাবে কাকে পছন্দ করবে?

প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যে সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় (Factors Considered for Selecting Suitable Field for Self-employment)

আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের উপর। তাই আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

- **সঠিক পণ্য নির্বাচন**

  ব্যবসার জন্য সঠিক পণ্য নির্বাচন সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত। পণ্য নির্বাচনের পূর্বে বাজারে পণ্যটির চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা যথাযথভাবে নিরূপণ করতে হবে।

- **প্রাথমিক মূলধন**

  ব্যবসা সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য স্থায়ী ও চলতি মূলধন পর্যাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনীয় মূলধন নির্ধারণ ও সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে ব্যবসায়ের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। চলতি পুঁজির অভাবে বাংলাদেশের অনেক শিল্প-কারখানা উৎপাদন ক্ষমতার মাত্রা অনুযায়ী পরিচালিত হতে পারে না।

- **পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ**

বাজার জরিপ ও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে পণ্যের সঠিক চাহিদা নিরূপণ ব্যবসায়ে সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাছাড়া পণ্যের বাজারের পরিধি এবং বাজারজাতকরণের কৌশল পূর্বেই যথার্থভাবে নিরূপণ করতে হবে।

- **অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা**

উদ্যোক্তার ব্যবসা সম্পর্কে পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবসায় সফল হতে সাহায্য করে। গবেষণার ফল থেকে দেখা গেছে যে, কোনো ব্যবসায়ের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে মালিকদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব।

- **নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ থাকা**

শিল্পোদ্যোক্তা যদি তার নিজের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সজাগ থাকেন তবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংকট এড়ানো যায়।

- **যৌথ উদ্যোগ**

পারিবারিক সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগ ব্যবসায়ের সফলতা, অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে সকল ব্যবসায় যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত আছে সে সকল ব্যবসায় বেশি সফল হতে দেখা যায়।

- **সঠিক কর্মী নির্বাচন**

ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে সব কর্মী নিয়োগ করা হবে তাদেরকে অবশ্যই যোগ্যতা সম্পন্ন এবং স্বীয় কাজে দক্ষ হতে হবে। কাজেই কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে নির্বাচন করতে হবে। নিয়োগকৃত কর্মীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে কোনো কর্মী নিয়োগ করা উচিত নয়।

- **ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচন**

ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাঁচামালের সহজলভ্যতা, বাজারজাতকরণের সুবিধা, অবকাঠামোগত সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

- **সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার**

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় ও আমদানিকৃত প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ব্যবসার সাফল্য অর্জনের পথ সুগম করে। ব্যবসা শুরু করার পূর্বে উদ্যোক্তাদের এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

- **দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা**

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যবসায়ের সাফল্যকে প্রভাবিত করে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দেশের চলমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্যকভাবে অবহিত থেকে সে আলোকে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবসায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন। অধিকন্তু ব্যবসায় সাফল্য লাভ করতে হলে যে সব বিষয় ব্যবসায় কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে সে সব বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে।

- **ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবেলায় উপায় অবলম্বন**

ব্যবসা সংক্রান্ত ঝুঁকি আগেই নিরূপণ করে তার মোকাবেলা করার কৌশল স্থির করে রাখলে অনিশ্চয়তাজনিত ক্ষতির হাত থেকে ব্যবসাকে রক্ষা করা যায়। কাজেই উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসায় ঝুঁকি নিরূপণ ও তা মোকাবেলার উপায় নির্ধারণ ব্যবসায় সাফল্য লাভের অন্যতম শর্ত।

- **ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ**
  ব্যবসায় একবার ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে হতাশ হওয়ার পরিবর্তে শিক্ষা গ্রহণ করে নতুনভাবে কাজ শুরু করার মধ্যে ব্যবসায়ের সাফল্য নিহিত।

- **সুষ্ঠু ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন**
  ব্যবসায় সফলতা অর্জনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন। ব্যবসায়ে হাত দেওয়ার পূর্বেই ব্যবসার কাজ কখন এবং কীভাবে করা হবে তা অগ্রিম চিন্তা করে ঠিক করাই হচ্ছে পরিকল্পনা। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হচ্ছে দিকনির্দেশনা দলিল। পরিকল্পনা প্রণয়ন যত বেশি সমৃদ্ধ হবে ব্যবসায়ে সফল হওয়ার নিশ্চয়তাও তত বেশি হবে।

এবার মিলিয়ে দেখ তুমি যে ক্ষেত্রগুলো নির্বাচন করেছ তাতে এই বিষয়গুলো রয়েছে কিনা। এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে তোমার নির্বাচিত ১০টি ক্ষেত্র থেকে ৫টি ক্ষেত্র নির্বাচন কর এবং নির্বাচন করার কারণ উল্লেখ কর :

ক্ষেত্রের নাম	নির্বাচনের কারণ

আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণে করণীয় (Requisits to Motivate for Self-employment)

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত দক্ষতা ও স্বনির্ভর পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা অর্জনের প্রবল ইচ্ছা শক্তি। যেহেতু দেশে চাকরির সুযোগ সীমিত এবং ইচ্ছা করলেই সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে এত অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব নয় তাই একমাত্র বিকল্প হচ্ছে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করা। কিন্তু এ দেশের যুবসমাজের নিকট আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা স্বচ্ছ ও যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের সামাজিক মূল্যবোধ ও পুঁথিগত পড়াশুনার কারণে যুবসমাজ জীবিকা বলতে চাকরিকে বুঝে থাকে। ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানের যুব ও তরুণসমাজ ও আগামী প্রজন্মকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। যেমন–

- শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে এ বলে যে, কোনো পেশা বা কাজই ছোট ও অপমানের নয়।
- স্ব স্ব এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যারা স্বাবলম্বী ও সফল হয়েছে তাদেরকে বিদ্যালয়ের এনে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের জীবনকাহিনী শোনাতে হবে।
- স্ব স্ব এলাকার আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলোর তালিকা প্রণয়ন করে বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদের দেয়ালে প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- বিদ্যালয় বা কলেজ থেকে যে সকল শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে কিংবা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ পায় না তাদেরকে বিভিন্ন উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষাকে পর্যাপ্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- আত্মকর্মসংস্থানকে সামনে রেখে যুব উন্নয়ন ব্যাংক ও শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা বর্তমানে সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাদেরকে বিদ্যালয় পর্যায়ে সংবর্ধনা ও সম্মাননা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Training in Self-employment)

কোনো বিশেষ কাজ যথার্থভাবে সম্পাদন করার স্বার্থে এবং জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। বড় প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা উচিত। নিয়োগ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণের একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচি থাকলে অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মীর জন্য বাইরে থেকে কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। প্রশিক্ষণ হলো সর্বস্তরের কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতা বিকাশের অবিরাম ও নিয়মিত প্রচেষ্টা যাতে তাদের যোগ্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানটিও লাভবান হয়। কোনো কর্মীকে সঠিক কাজে নিয়োগ করার পূর্বে তাকে প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাসহ নতুন ও পুরাতন সকল কর্মীর জন্যই অপরিহার্য। নিম্নে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো :

- **কার্য প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে পরিচিতি**

  প্রতিষ্ঠানের কর্মের প্রকৃতি ও কর্ম পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়া নবনিযুক্ত কর্মীদের জন্য আবশ্যক। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নতুন কর্মীদের কর্ম পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

- **দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীদের অপ্রতুলতা দূরীকরণ**

  প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সবসময় উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য নিয়োগের পর কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে প্রয়োজন পূরণ করা হয়।

- **কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি**

  প্রশিক্ষণ কর্মীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। তাই নতুন পুরাতন সকল কর্মীর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

- **সম্পদের সদ্ব্যবহার**

  প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের কর্মদক্ষতা বেড়ে যায়। ফলে উদ্যোক্তা বা কর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য সম্পদের উৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্ভব হয়।

- **নৈতিক বল বৃদ্ধি**

  প্রশিক্ষণ উদ্যোক্তা বা কর্মচারীদের মনোভাবের উন্নতি সাধন করে। ফলে তাদের নৈতিক বল বৃদ্ধি পায়। প্রশিক্ষণ কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় আনয়নে সহায়তা করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্য কাম্য গতিতে চলতে পারে।

- **অপচয় ও দুর্ঘটনা হ্রাস**

  প্রশিক্ষিত কর্মীগণ অধিকতর দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে কার্য সম্পাদন করতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাস পায়। প্রশিক্ষণ কর্মীদেরকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিবিধ কলা-কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। ফলে কারখানার যন্ত্রপাতি ব্যবহারসহ অন্যান্য দুর্ঘটনা এড়ানোও সহজ হয়।

  পরিশেষে বলা যায়, কর্মীর দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্য নির্বাহের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নতুন ও পুরাতন উভয় প্রকার কর্মীকেই উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে না পারলে তাদের দিয়ে ভালো কাজ আশা করা যায় না। তাই কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকীয় কর্তব্য।

আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (Training Institutes for Helping Self-employment)

যে সমাজ ও দেশে উদ্যোক্তার সংখ্যা যত বেশি, সে সমাজ বা দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত উন্নত। বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাকারী বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আছে। এ সকল সংস্থা ভূমিহীন, বিত্তহীন জনগণকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দান, ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্থাপনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, ঋণ ব্যবহার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে দুস্থ লোকদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড, গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের প্রকল্প, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নট্রামস উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এগুলোর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো–

১. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজম্যান্ট (Bangladesh Institute of Management)

বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। নির্দিষ্ট ফি–এর বিনিময়ে এটি আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগ উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রধান প্রধান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠাকরণ, মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রভৃতি।

২. মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Women Affairs)

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় মূলত মহিলাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে গ্রামের দুস্থ, শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মহিলাদেরকে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া এর মূল উদ্দেশ্য। এটি উদ্যোগী মহিলাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

৩. বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (Bangladesh Rural Development Board)

বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড বা বিআরডিবি গ্রামের দুস্থ ও ভূমিহীন নারী-পুরুষদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারা স্বাধীনভাবে একটি পেশা বেছে নিয়ে উপার্জন করতে পারে। দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় বিআরডিবির কার্যক্রম বিস্তৃত।

বিআরডিবি থেকে ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী নারী

৪. গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রকল্প (Employment Generation Project of Rural women)

এ প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লি অঞ্চলের মহিলাদেরকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাই ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৫. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Youth training centre)

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দেশের প্রতিটি থানায় এর কেন্দ্র রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতীদেরকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যেমন- হাঁস মুরগির খামার তৈরি, মৎস্য চাষ,সবজি বাগান, নার্সারি করা, সেলাইয়ের কাজ, কুটির শিল্পের কাজ, কম্পিউটার চালনা প্রভৃতি। এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত একজন বৃদ্ধা

৫. নট্রামস (Notrams):

নট্রামস শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনা শিক্ষা দেওয়াই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেও বহু শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাদের এ কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন–২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট কর্মহীন লোকের সংখ্যা হচ্ছে–

ক. ৬ লক্ষ   খ. ১৬ লক্ষ

গ. ২৬ লক্ষ   ঘ. ৩৬ লক্ষ

২. আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচনা করতে হয়–

i. সঠিক পণ্য

ii. মুনাফার নিশ্চয়তা

iii. পণ্যের চাহিদা

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

এসএসসি পাস শিখা কম্পিউটারে পারদর্শী। বাড়িতে সে কয়েকটি মেয়েকে কম্পিউটার শেখায়। দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। তার ইচ্ছা কম্পিউটারে আরও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যাতে সে এ ক্ষেত্রটিকে কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

৩. নিচের কোন সংস্থা থেকে শিখা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে?

ক. বিআরডিবি   খ. বিআইএম

গ. বিআইবিএম   ঘ. নট্রামস

৪. উদ্দীপকে বর্ণিত কাজটিকে ভবিষ্যতে শিখার কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে গ্রহণ করার যৌক্তিক কারণ কোনটি?

ক. সামাজিক অবস্থান ভালো   খ. বাজার চাহিদা ভালো

গ. শিক্ষার্থীদের অনুরোধ   ঘ. কম্পিউটারে অধিক পারদর্শী হওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঐশী, সাদী ও সামী তিন বন্ধু সম্প্রতি বি কম পাস করেছে। তারা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিল। ঐশী ও সাদী এম কম-এ ভর্তির চিন্তা করছে। সামী এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারেনি। কারণ তার বাবার ইচ্ছা সে মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে চলে যাক। কিন্তু মেধাবী সামী চায় দেশেই কিছু করতে। এ জন্য সে হাঁস–মুরগি পালনের উপর দু'মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে তার মনোবল বেড়ে যায়। বিদেশ যাবার টাকা দিয়ে সে বাড়িতে হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে নিজের চেষ্টায় আজ সে স্বাবলম্বী।

ক. জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান শতকরা কতভাগ?

খ. বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. সামীর হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. স্বাবলম্বী হবার পেছনে কোন গুণটি সামীকে বেশি প্রভাবিত করেছে বলে তুমি মনে কর। বিশ্লেষণ কর।

২. রাঙামাটির স্কুল শিক্ষক মামাপ্রু মারমা স্থানীয় তাঁতী মেরিনা মারমাকে তাঁতে বোনা পণ্য-সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দেন। ব্যাপক চাহিদার কথা চিন্তা করে মেরিনা পাহাড়ি মেয়েদের পোশাক "থামি" তৈরি করে বিক্রি করা শুরু করে এবং দ্রুত উন্নতি লাভ করে। মেরিনার কারণে বেশ কয়েকটি মেয়ের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার জেলায় বিগত তিন বছর যাবত তিনি সেরা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন।

ক. দেশের মোট শ্রমশক্তির কত অংশ যুবক–যুবতী?

খ. আত্মকর্মসংস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

গ. মেরিনার দ্রুত উন্নতিতে কোন বিষয়টি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মামাপ্রু মারমার পরামর্শ প্রতিপালনই মেরিনা চাকমার জীবনে এত স্বীকৃতি এনে দিয়েছে' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়

Business Based on Ownership

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি ব্যবসায় হলো প্রধানত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার পণ্য-দ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন, বণ্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। ভোক্তাদের বিভিন্নমুখী চাহিদা, মালিকানা, ব্যবসায়ীদের নিজস্ব মনোভাব ও আকার ও বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় সংগঠনের সৃষ্টি হয়। আমরা এ অধ্যায়ে মালিকানার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন এবং এগুলোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রকারভেদ ও আইনগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ ও জনপ্রিয়তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন ও এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারব।
- যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সমবায় সমিতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সমবায় সমিতির গঠন ও নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় সমিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাষ্ট্রীয় কারবারের ধারণা, বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিতে পারব।

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের প্রকারভেদ (Different Types of Business on the Basis of Ownership)

মানুষের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণের জন্য যুগে যুগে মালিকানা ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে উঠেছে। মুনাফা অর্জনের সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে মিল থাকলেও প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, আওতা, আয়তন ও কার্যক্ষেত্রের ভিত্তিতে এদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠনগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় :

১. একমালিকানা ব্যবসায়
২. অংশীদারি ব্যবসায়
৩. যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠন
৪. সমবায় সমিতি
৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

একমালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা (Concept of Sole Proprietorship Business)

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একক মালিকানায় পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এ জন্য এটিকে সবচেয়ে প্রাচীনতম ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায়, মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন যোগাড় করে কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করে, তখন তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একমালিকানা ব্যবসায় গঠন অত্যন্ত সহজ। যে কোনো ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে স্বল্প অর্থ নিয়ে এ জাতীয় কারবার শুরু করতে পারেন। সাধারণত এ জাতীয় ব্যবসায়ের আয়তন ছোট হয়। তবে প্রয়োজনে মালিক একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন এবং অধিক অর্থও বিনিয়োগ করতে পারেন। আইনের চোখে একমালিকানা ব্যবসায়ের তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজার বা রাস্তার পাশে কিংবা নিজ বাড়িতে যে কেউ ছোট-খাটো ব্যবসা শুরু করতে পারে। তবে শহরে বা পৌরসভা এলাকায় উদ্যোক্তাকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে ব্যবসা আরম্ভ করতে হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যবসায় সংগঠন একমালিকানার ভিত্তিতে গঠিত। শুধু তাই নয় ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় ৮০% ব্যবসায় এক মালিকানাভিত্তিক। আমাদের দেশের সাধারণ মুদি দোকান, চায়ের দোকান, সবজি দোকান, অধিকাংশ খুচরা দোকান একক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sole Proprietorship Business)

একমালিকানা ব্যবসায় হলো এমন এক ধরনের ব্যবসায় যার উদ্যোক্তা, মালিক, পরিচালক ও অর্থের যোগানদাতা একই ব্যক্তি এবং তিনি নিজেই এককভাবে ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি, দায়, লাভ ও লোকসান বহন করেন। নিম্নে একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হলো–

- একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক সব সময় একজন ব্যক্তি যিনি নিজ উদ্যোগে পুঁজির সংস্থান করেন, ব্যবসায় পরিচালনা করেন ও ঝুঁকি বহন করেন ।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ের গঠন বেশ সহজ। আইনগত ঝামেলা না থাকায় যে কেউ ইচ্ছা করলে ও উদ্যোগ নিলে এ ব্যবসায় শুরু করতে পারেন।
- স্বল্প মূলধন নিয়ে এ জাতীয় ব্যবসায় গঠন করা যায়। মালিক নিজেই এ মূলধন যোগান দেন। সাধারণত নিজস্ব সঞ্চয় ও প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করেন।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমালিকানা ব্যবসায় ক্ষুদ্র আকারের হয়ে থাকে। মূলধনের স্বল্পতা ও একজন ব্যক্তির মালিকানার জন্য এর আয়তন সাধারণত ছোট হয়ে থাকে।

- একমালিকানা ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি মালিককে এককভাবে বহন করতে হয়।
- আইনের চোখে একমালিকানা ব্যবসায়ের পৃথক কোনো সত্তা নেই। মালিক ও ব্যবসায় অভিন্ন।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব মালিকের। ফলে তার দায় অসীম। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ করতে হয়।
- পুরো ব্যবসায়ের একক মালিকানার জন্য লাভের সবটা মালিক একা ভোগ করেন। আবার লোকসানের সম্মুখীন হলে মালিককেই এককভাগে তা বহন করতে হয়।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কারণ ব্যবসায় চালু রাখা বা বন্ধ করা মালিকের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

কর্মপত্র-১ : একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করে এ ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো চিহ্নিত কর

একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ	একমালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধাসমূহ
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ (Suitable Areas for Sole-proprietorship Business)

একমালিকানা ব্যবসায় প্রাচীনতম ব্যবসায় হিসেবে বিশ্বের অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত সকল দেশেই স্বীকৃত। প্রাচীনতম ব্যবসায় হলেও বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসায় হিসেবে টিকে আছে। একমালিকানা ব্যবসায়ে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা আছে যে কারণে এ জাতীয় ব্যবসায় সকলের নিকট জনপ্রিয়। একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. অনেকে আছেন যাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই অথচ ব্যবসায় শুরু করতে আগ্রহী। আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী এমন হাজার হাজার লোকের জন্য একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে উপযুক্ত। যেমন- চায়ের দোকান, ছোট খাবারের দোকান, কুটির শিল্পের দোকান, মৃৎ শিল্পের দোকান।

২. এমন কিছু ব্যবসায় আছে যেগুলোর জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। সে জাতীয় ব্যবসায়ের জন্য একমালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে বেশি উপযোগী বিবেচিত হয়। যেমন- পানের দোকান, সবজির দোকান।

৩. যে সকল ব্যবসায়ে ঝুঁকি একেবারেই কম সেগুলোর জন্য একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। কেননা কম আয়ের ব্যক্তিরা সাধারণত ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চান, ফলে তারা এমন ব্যবসায়ই বেশি পছন্দ করেন। যেমন- চালের দোকান, ঔষধের দোকান।

৪. কিছু কিছু ব্যবসায় আছে যেগুলোর প্রদত্ত পণ্য বা সেবার চাহিদা বিশেষ বিশেষ এলাকা বা নির্দিষ্ট শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট সীমাবদ্ধ। সে সব পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। যেমন- স্কুলের সামনে বই-খাতার দোকান, কোনো শিল্প কারখানার সামনে রেস্টুরেন্ট।

৫. পঁচনশীল জাতীয় পণ্য যেমন ফল-মূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস ইত্যাদির ব্যবসায় সাধারণত একমালিকানা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৬. ডাক্তারি, প্রকৌশল ও আইন ব্যবসায়ের মতো ক্ষুদ্র আকারের পেশাভিত্তিক ব্যবসায় এবং প্রত্যক্ষ সেবাধর্মী ব্যবসায় যেমন লন্ড্রি, সেলুন, বিউটি পার্লার ইত্যাদি সাধারণত একমালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৭. অনেক পণ্য আছে যেগুলোর চাহিদা ক্রেতাদের পরিবর্তনশীল রুচি, আগ্রহ ও ফ্যাশনের উপর নির্ভরশীল। সে সকল পণ্যের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। যেমন-দরজির দোকান।

৮. যে সব ব্যবসায় প্রদত্ত পণ্য-দ্রব্য ও সেবার সাথে ব্যক্তির বা মালিকের নৈপুণ্য, শিল্পকর্ম ও সুনাম জড়িত থাকে সেগুলোর জন্য একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। যেমন-চিত্রকর্মের দোকান, ছবি তোলার দোকান, স্বর্ণকারের দোকান, ফার্নিচারের দোকান, মিষ্টির দোকান।

৯. কৃষিজাত পণ্য ও সহায়ক পণ্যের ব্যবসার জন্যও একমালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত। যেমন- ধান ব্যবসায়, আলু ব্যবসায় ও কাঁচামালের ব্যবসায়।

১০. স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের বই, খাতা-পত্র, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশনা ব্যবসায়ের জন্য একক মালিকানাভিত্তিক ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, স্বাধীনচেতা মনোভাব, স্বল্প পুঁজি ও স্বল্প শ্রম বিনিয়োগ করে একমালিকানা ব্যবসায় যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে শুরু করা যায়। এ ব্যবসায় আইনি জটিলতামুক্ত এবং এতে ঝুঁকিও কম। অন্যদিকে একমালিকানা ব্যবসায় ভোক্তাদের অত্যন্ত নিকটে থেকে তাদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী পণ্য বা সেবা প্রদান করতে পারে। ফলে প্রাচীন ব্যবসায় সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র যেমন ব্যাপক, তেমনি সকলের নিকট এ ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তাও বেশি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনায় একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি উপযোগী। যার কারণে বাংলাদেশের বর্তমান মোট ব্যবসায় সংগঠনের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি একমালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে দেশে বিরাজমান বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে যুবসমাজকে একমালিকানা ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করতে ঋণ পাওয়া সহজ করাসহ আরো সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন।

কর্মপত্র-২ : একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে এর জনপ্রিয়তার কারণগুলো খুঁজে বের কর

একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার কারণ	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা (Concept of Partnership Business)

ব্যবসায় জগতে একমালিকানা সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় হলেও একক মালিকের মূলধনের স্বল্পতা, অসীম দায়, ব্যবসায়ের ক্ষুদ্র আওতা ইত্যাদি সীমাবদ্ধতার জন্য ব্যবসায়ের পরিধি আরো বৃদ্ধি ও ঝুঁকি কমিয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে একাধিক ব্যক্তি মিলে নিজেদের পুঁজি ও সামর্থ্য একত্রিত করে যে নতুন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে উঠে তাকেই অংশীদারি ব্যবসায় বলে অভিহিত করা হয়। মূলত একমালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলো দূর করার প্রয়োজনেই অংশীদারি ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। তবে অংশীদারি ব্যবসায়ে কিছু কিছু সমস্যাও দেখা দেয়। বিশেষ করে মুনাফা বণ্টন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দায়িত্ব ও কর্ম বিভাজন, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও আস্থার সংকট দেখা দিতে পারে। ফলে অংশীদারি চুক্তিপত্র ও অংশীদারি আইন প্রণয়ন করতে হয়। বাংলাদেশের অংশীদারি ব্যবসায় '১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন' দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে অংশীদারি চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। একের অধিক বলতে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন অংশীদারকে বুঝায়। তবে অংশীদারি ব্যবসায়টি যদি ব্যাংকিং ব্যবসায় হয় তখন সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ১০-এর বেশি হবে না। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ নং ধারা মতে 'সকলের দ্বারা অথবা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত' ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ককে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। যারা এরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে 'অংশীদার' এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন (Formation of Partnership Business)

আমরা জেনেছি যে, অংশীদারি ব্যবসায় হলো মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত এক ধরনের ব্যবসায় যেখানে তারা সকলে অথবা তাদের মধ্য থেকে একজন সবার পক্ষে উক্ত ব্যবসাটি পরিচালিত করে থাকে। একমালিকানার মতো অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠনও অনেক সহজ। এর গঠনেও আইনগত জটিলতা নেই। চুক্তি সম্পাদনের জন্য যোগ্য কমপেক্ষ দুজন ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে এরূপ ব্যবসায় শুরু করতে পারে। তবে চুক্তি লিখিত হবার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনে চুক্তি ও নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করা হয় নি। তাই মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতেও ব্যবসায় পরিচালিত হতে পারে। তবে অংশীদারদের মধ্যে ভবিষ্যতে ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য, বিরোধ এবং মামলা এড়ানোর জন্য চুক্তি লিখিত ও নিবন্ধিত হওয়া যৌক্তিক। এজন্য চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়। আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করার জন্য সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Partnership Business)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে অংশীদারি ব্যবসায় একমালিকানা ব্যবসায়ের মতোই প্রাচীন ব্যবসায় সংগঠন। তবে একমালিকানা ব্যবসায়ের কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করার প্রয়োজনে অংশীদারি ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। একমালিকানা ব্যবসায়ের সাথে এ ব্যবসায়ের কিছু কিছু মিল থাকলেও অংশীদারি ব্যবসায়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো একে একমালিকানা ও অন্যান্য যৌথ উদ্যোগী ব্যবসায় থেকে আলাদা করেছে। নিচে অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

১. আইনগত ঝামেলা না থাকায় অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠনও বেশ সহজ। চুক্তি সম্পাদনের জন্য যোগ্য একাধিক ব্যক্তি মৌখিক বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে এ ব্যবসায় শুরু করতে পারে। একাধিক ব্যক্তি বলতে সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জনকে বোঝায়। ব্যবসায়টি যদি ব্যাংকিং সংক্রান্ত হয় তখন সদস্য সংখ্যা ১০ জনের বেশি হতে পারবে না।

২. অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের আলোকেই এ ব্যবসায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এরূপ চুক্তি হতে পারে মৌখিক বা লিখিত, নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত।

৩. এ ব্যবসায়ের অংশীদারগণ চুক্তিতে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী মূলধন সরবরাহ করে থাকে। ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানও চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হয়। চুক্তিতে কিছু উল্লেখ না থাকলে সমান হারে লাভ-লোকসান বণ্টিত হবে। আবার চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে কেউ মূলধন না দিয়েও অংশীদার হতে পারে। তবে প্রত্যেক অংশীদারের দায় ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে অসীম। অর্থাৎ কোনো দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবসায়িক সম্পদ যথেষ্ট না হলে অংশীদারগণের ব্যক্তিগত সম্পদ সেজন্য দায়বদ্ধ থাকে। কোনো অংশীদার দেউলিয়া হলেও তার দায় অবশিষ্ট অংশীদারগণকে বহন করতে হয়।

৪. পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এ ব্যবসায় গড়ে উঠে এবং এ ব্যবসায়ের সফলতা এর উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে অংশীদারগণের মধ্যে আস্থাহীনতা, বিশ্বাসের অভাব ও বিরোধ দেখা দিলে ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটে।

৫. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে যে সকল অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হয়, সেগুলো অনিবন্ধিত ব্যবসায় থেকে বেশ কিছু বেশি সুবিধা ভোগ করে থাকে। নিবন্ধিত হলেও এ ব্যবসায়ে কোনো আইনগত সত্তার সৃষ্টি হয় না। ফলে ব্যবসায় নিজস্ব নামে পরিচালিত হতে পারে না। ব্যবসায়ের সকল লেনদেনও অংশীদারদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে হয়েছে বলে ধরা হয়। পুনঃ আইনগত সত্তা না থাকায় এ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব অংশীদারদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

কর্মপত্র- ৩ : অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করে উক্ত ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা/ সবল দিক	অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধা/ দুর্বল দিক
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র (Deed of Partnership Business)

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয়। চুক্তি মৌখিক হতে পারে। আবার চুক্তি লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে। তবে মৌখিক, লিখিত ও নিবন্ধিত যেভাবেই হোক, অংশীদারি ব্যবসায় শুরু

করার জন্য চুক্তি করা বা চুক্তি থাকা বাধ্যতামূলক। এজন্যই চুক্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি বলা হয়। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনে বলা হয়েছে 'অংশীদারি সম্পর্ক সৃষ্টি হয় চুক্তি থেকে, মর্যাদা থেকে নয়'। লিখিত চুক্তিকে চুক্তিপত্র বলে। অংশীদারি চুক্তিপত্র হলো এমন একটি দলিল যাতে উক্ত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, অংশীদারদের প্রত্যেকের অবস্থান, দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার এবং ভবিষ্যতে বিরোধ মীমাংসা করার পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। চুক্তিপত্র সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, চুক্তি ছাড়া মুনাফা অর্জন ও বণ্টনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় পরিচালনা করলেও তা অংশীদারি ব্যবসায় বলে বিবেচিত হবে না। যেমন- পিতার মৃত্যুর পর সন্তানেরা যদি তার অংশীদারি ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হন এবং নিজেরা উক্ত ব্যবসায় পরিচালনা করেন ও অর্জিত মুনাফা বণ্টন করে নেন, তাহলেও এটি অংশীদারি ব্যবসায় বলে গণ্য হবে না যদি তাদের মধ্যে কোনো চুক্তি না থাকে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু (Contents of Deed of Partnership Business)

চুক্তিপত্র অংশীদারি ব্যবসায়ের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। ভবিষ্যতে অংশীদারদের মধ্যে যাতে কোনো বিভেদ বা মতবিরোধ সৃষ্টি না হয় এবং ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো জটিলতা না ঘটে সেজন্য চুক্তিপত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ থাকে। সাধারণত চুক্তিপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে :

১. অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম ও ঠিকানা

২. ব্যবসায়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও আওতা

৩. ব্যবসায়ের কার্যকাল বা স্থায়িত্ব

৪. অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা

৫. ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমাণ

৬. প্রত্যেক অংশীদারের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ও পরিশোধ পদ্ধতি

৭. ব্যবসায় পরিচালনার নিয়মাবলি

৮. যে সকল অংশীদার প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করবেন তাদের পরিচিতি

৯. ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান বণ্টন পদ্ধতি

১০. অংশীদারদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার

১১. যে ব্যাংকে হিসাব খোলা হবে তার নাম, ঠিকানা ও হিসাবের ধরন।

১২. ব্যাংকের হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তিগণের নাম

১৩. নতুন অংশীদার গ্রহণ ও পুরাতন অংশীদারের বিদায়ের নিয়মাবলি

১৪. অংশীদারের মৃত্যুতে তার অংশ নির্ধারণ, সংরক্ষণ ও পরিশোধ পদ্ধতি

১৫. অংশীদারদের অবসরগ্রহণ ও বহিষ্কারের পদ্ধতি

১৬. ভবিষ্যতে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা পদ্ধতি

১৭. বিলোপ সাধনের পদ্ধতি

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন (Registration of Partnership Business)

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত নিবন্ধক অফিসে ব্যবসায়ের নাম তালিকাভুক্তকরণকে বোঝায়। বাংলাদেশের অংশীদারি আইনে ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হলেও অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় থেকে নিবন্ধিত ব্যবসায়গুলো বেশ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ের যে কোনো অংশীদারই অপর কোনো অংশীদারের বিরুদ্ধে চুক্তিতে উল্লিখিত অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে যা অনিবন্ধিত ব্যবসায় পারে না। নিবন্ধিত না হলে চুক্তিতে উল্লিখিত অধিকার আদায়ের জন্য অপর কোনো তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধেও মামলা করতে পারে না। অন্যদিকে তৃতীয় কোনো পক্ষ যদি অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, শুধু অনিবন্ধিত হবার কারণে বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে পাল্টা পাওনা দাবি করতে পারে না। তাছাড়া অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান তৃতীয় কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকার বেশি পাওনা আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে না। সুতরাং বলা যায় নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় যেহেতু অনিবন্ধিত ব্যবসায় থেকে কিছু বেশি সুবিধা ভোগ করে, সেহেতু অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন করাটাই বেশি যৌক্তিক। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করার জন্য আবেদনপত্রের সাথে যে সকল বিষয় উল্লেখ করতে হয় সেগুলো হলো–

- অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নাম
- প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা
- শাখা কার্যালয় থাকলে সেগুলোর ঠিকানা
- ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য
- ব্যবসায় শুরুর তারিখ
- ব্যবসায় মোট কার্যকাল বা স্থায়িত্ব কাল
- অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা
- অংশীদার হিসেবে ব্যবসায়ে যোগদানের তারিখ

সকল অংশীদারের স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্রটি নিবন্ধন অফিসে জমা দিলে নিবন্ধক তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। উপরোক্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করবেন এবং পত্র দ্বারা তা জানিয়ে দিবেন। পত্র প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ হয়।

কর্মপত্র–৪ : অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় যে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় সেগুলো চিহ্নিত কর
১.
২.
৩.
৪.

অংশীদারের প্রকারভেদ (Classification of Partners)

অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারগণ ব্যবসায়ের বিভিন্ন ধরনের অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব-কর্তব্য বিবেচনা করে পছন্দমতো অংশীদার হতে পারেন। বিভিন্ন প্রকার অংশীদারের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো–

বিভিন্ন প্রকার অংশীদার	ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
সাধারণ অংশীদার (Ordinary Partner)	• অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ এবং স্বক্রিয়ভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। • অংশীদারদের দায় অসীম। • চুক্তি অনুযায়ী লাভ বা ক্ষতির অংশ পায়। • চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিক পায়।
ঘুমন্ত অংশীদার (Sleeping Partner)	• অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে। • চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পায়। • অধিকার থাকা সত্ত্বেও স্বক্রিয়ভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। • অংশীদারদের দায় অসীম। • ব্যবসায়ের কোনো কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদবদ্ধ নয়।
নামমাত্র অংশীদার (Nominal Partner)	• অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না। • ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। • চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ বা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নিজের সুনাম ব্যবহারের অনুমতি দেয়। • অংশীদারদের দায় সাধারণ অংশীদারদের মতো অসীম নয়। • তবে কোনো তৃতীয় পক্ষ যদি তাকে অংশীদার মনে করে ঋণ দেয় এবং তা প্রমাণ করতে পারে তাহলে সে ঋণের জন্য সাধারণ অংশীদারের ন্যায় দায়বদ্ধ।
আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার (Quasi Partner)	• এ জাতীয় অংশীদারগণ ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও মূলধন উত্তোলন না করে তা ঋণ হিসেবে ব্যবসায়ে জমা রাখে। • প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ব্যক্তিগণ ব্যবসায়ের পাওনাদার। • তবে কোনো সাধারণ অংশীদার গণবিজ্ঞপ্তি না দিয়ে ব্যবসায়ে এভাবে থেকে গেলে ব্যবসায়ের কোনো কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী হবে।
সীমিত অংশীদার (Limited Partner)	• চুক্তি অনুযায়ী কোনো অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ হলে বা আইন অনুযায়ী সকল অংশীদারের সম্মতিতে কোনো নাবালককে সুবিধা প্রদানের জন্য অংশীদার করা হলে তাকে সীমিত অংশীদার বলা হয়। • অংশীদারদের দায় ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। • ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। • চুক্তি অনুযায়ী কোনো সাবালক ব্যক্তিও এরূপ অংশীদার হতে পারে।
আচরণে অনুমিত অংশীদার (Partner by holding out)	• কোনো ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ের অংশীদার না হয়েও মৌখিক কথাবার্তা, লেখা বা অন্য কোনো আচরণের দ্বারা নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেন, তবে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলা হয়। • যদি কেউ তার আচরণে প্রভাবিত হয়ে ঋণ দেয় বা চুক্তি করে তাহলে সে অংশীদার দায়ী থাকবে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন (Dissolution of Partnership Business)

অংশীদারি ব্যবসায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে, সকল অংশীদারদের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কের বিলোপ সাধনই হচ্ছে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন। অংশীদারি আইনের বিধান অনুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তি হতে পারে:

১. **সকলে একমত হয়ে বিলোপসাধন** : অংশীদারি আইনের ৪০ নং ধারা অনুসারে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে এ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন হতে পারে।

২. **বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন** : অংশীদারি আইনের ৪১ ধারা অনুসারে নিম্নোক্ত দুটি কারণে বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন হতে পারে–

ক. একজন ব্যতীত সকল অংশীদার অথবা সকল অংশীদার ব্যতীত একজন দেউলিয়া বলে বিবেচিত হলে; কিংবা

খ. কোনো কার্য দ্বারা ব্যবসায়টি আইন বিরুদ্ধ বা অবৈধ হয়ে পড়লে।

৩. **বিশেষ ঘটনাসাপেক্ষে বিলোপসাধন** : অংশীদারি আইনের ৪২ ধারায় বলা হয়েছে যে, অংশীদারি চুক্তিতে উল্লিখিত নিম্নোক্ত যে কোনো কারণে বিলোপ সাধন হতে পারে:

ক. ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে;

খ. ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট কাজ শেষ হয়ে গেলে;

গ. কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে;

ঘ. আদালত কর্তৃক কোনো অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে।

৪. **বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপসাধন** : অংশীদারি আইনের ৪৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অন্য অংশীদারের কাছে ব্যবসায় বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এ ধরনের ব্যবসায়ের বিলুপ্তি হয়।

৬. **আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন** : অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, নিম্নোক্ত যে কোনো কারণে আদালত অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে–

ক. কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে;

খ. কোনো অংশীদার দায়িত্ব পালনে চিরতরে অসমর্থ হলে;

গ. কোনো অংশীদারের অসদাচরণের জন্য অংশীদারদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হলে;

ঘ. কোনো অংশীদার তার প্রাপ্য অংশ তৃতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করার মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গ করলে;

ঙ. ব্যবসায়ে ক্রমাগত লোকসান হতে থাকলে এবং লোকসান ব্যতীত ব্যবসায় পরিচালনা অসম্ভব হলে;

উল্লিখিত কারণ ছাড়াও অন্য যে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে আদালত অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তির নির্দেশ দিতে পারেন।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের ধারণা (Concept of Joint Stock Companies)

একমালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে ব্যবসায়ের যে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল কালক্রমে তা আর একমালিকানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। একমালিকানা ব্যবসায়ের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে মূলধনের স্বল্পতা ও একক পরিচালনা ও ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য অংশীদারি ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অংশীদারি ব্যবসায়ও মূলধনের

সীমাবদ্ধতা, আইনগত সীমাবদ্ধতা, স্থায়িত্বহীনতা ও অসীম দায়ের ভার থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এক সময় মানুষের চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসায়ের আওতা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে আইনের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় অধিক মূলধন ও বৃহদায়তনের যৌথ মূলধনী ব্যবসায় যা কোম্পানি সংগঠন নামেও পরিচিত। মূলত শিল্প বিপ্লবের কারণে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তার সাথে সাথে ব্যবসায় সংগঠনের প্রকৃতি ও আওতায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। উৎপাদন, বণ্টন ব্যবস্থা পারিবারিক গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে কারখানাতে স্থান নেয়। ফলে জন্ম হয় অধিক মূলধন, সীমিত দায়, যৌথ ব্যবস্থাপনা এবং আইনগত সত্তা ও পৃথক অস্তিত্ব বিশিষ্ট যৌথ মূলধনী ব্যবসায় সংগঠনের। উল্লেখ্য, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৭৫০–১৮৫০) সময়ে ইউরোপের কৃষিতে, শিল্পকারখানায়, কয়লা উত্তোলনে ও পরিবহন ব্যবস্থায় যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) নামে অভিহিত করা হয়।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট ও পরিচালিত হয়। সর্বপ্রথম কোম্পানি আইন পাস হয় ব্রিটেনে ১৮৪৪ সালে যা 'The Joint stock Company Act 1844' নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কোম্পানি আইন পাস হয় ১৮৫০ সালে। ১৯১৩ সালে ভারতীয় কোম্পানি আইন আবার নতুন করে পাস হয়। স্বাধীন বাংলাদেশেও অনেক বছর যাবত ১৯১৩ সালের কোম্পানি চালু ছিল। কোম্পানি আইনের ব্যাপক সংস্কার করে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে নতুন কোম্পানি আইন প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল কোম্পানি ব্যবসায় ১৯৯৪ সালের আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে কোম্পানি বলতে 'অত্র আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি অথবা বিদ্যমান কোনো কোম্পানিকে বুঝায়'। মূলত কোম্পানি সংগঠন হলো আইন দ্বারা সৃষ্ট, পৃথক অস্তিত্বসম্পন্ন, কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী এবং সীমিত দায়ের এমন এক ধরনের প্রতিষ্ঠান যেখানে কতিপয় ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে।

জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন : শিল্প বিপ্লবের স্মারক

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Features of Joint Stock Company)

বর্তমানের বৃহদায়তন ব্যবসায় জগতে এ জাতীয় ব্যবসায়ের গুরুত্ব অধিক। এ জাতীয় ব্যবসায়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। নিচে কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

১. যৌথ মূলধনী কোম্পানি একটি আইনসৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন। দেশের প্রচলিত কোম্পানি আইনের আওতায় এ ব্যবসায় গঠিত হয়। আইনি প্রক্রিয়ার অধীনে হয় বলে এর গঠন বেশ জটিল ও আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ। আইন অনুযায়ী এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সদস্য ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ।

২. কোম্পানি ব্যবসায় একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। কোম্পানি ব্যবসায় করতে আগ্রহী কিছু সংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ হয়ে কোম্পানি গঠন করে। তবে সদস্যদের কেউ ইচ্ছা করলে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে সহজেই ব্যবসায় থেকে বিদায় নিতে পারে। আবার কেউ ইচ্ছা করলে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে এর সদস্য পদও লাভ করতে পারে।

৩. আইনের দ্বারা সৃষ্ট বলে এ ব্যবসায়টি কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী। কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা বলতে বোঝায়, ব্যক্তি না হয়েও ব্যক্তির ন্যায় আইনগত মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করা। কোম্পানি যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তির মতো নিজ নামে অন্যের সাথে চুক্তি ও লেনদেন করতে পারে এবং প্রয়োজনে মামলাও করতে পারে। আবার অন্য কোনো পক্ষও কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

৪. কোম্পানি ব্যবসায় যেহেতু আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট তাই এর বিলুপ্তি ঘটাতে চাইলে তা করতে হবে আইনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায়। এভাবে সে চিরন্তন অস্তিত্বের মর্যাদা লাভ করে। কোনো শেয়ার হোল্ডারের মৃত্যু, দেউলিয়াত্ব বা শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে কোম্পানির বিলোপ সাধন হয় না।

৫. কৃত্রিম ব্যক্তি হওয়ার কারণে কোম্পানিকে একটি সিল ব্যবহার করতে হয়। কোম্পানির সকল কাজে ও কাগজপত্রে এ সিলের ব্যবহার বাধ্যতামূলক।

৬. আইনগতভাবেই কোম্পানির মূলধনকে কতকগুলো সমান অঙ্কের ক্ষুদ্র এককে ভাগ করা হয়। এরূপ প্রত্যেকটি একককে একটি করে শেয়ার বলে। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করে। এজন্য এগুলোকে শেয়ার মূলধন বলে। ১৮ বছরের উর্ধ্বে যে কোনো ব্যক্তি এবং যে কোনো প্রতিষ্ঠান শেয়ার কিনে এর সদস্যপদ লাভ করতে পারে। সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে এবং শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করার সুযোগ থাকার কারণে কোম্পানি ব্যবসায়ে অধিক মূলধনের সমাবেশ ঘটে।

৭. কোম্পানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ আলাদা। একমালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায়ের মতো মালিকেরা সরাসরি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে না। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে বেতনভুক্ত অন্য একটি পক্ষের উপর। পরিচালক বা মালিকগণ নীতি নির্ধারণ কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

৮. কোম্পানি ব্যবসায়ের সদস্যগণের দায় সীমিত। একমালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায়ের মতো অসীম নয়। সদস্যগণের দায় সাধারণত শেয়ার মূল্য ও প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ বলতে বোঝায় একজন শেয়ার মালিক যে মূল্যমানের শেয়ার কেনে তিনি শুধু সে পরিমাণ অর্থের জন্য দায়ী। অর্থাৎ যদি কোনো শেয়ার মালিক কোনো কোম্পানির ১০০ টাকা মূল্যের ১০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করেন তাহলে তার দায় শুধু ১০,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যদিকে প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানিতে একজন শেয়ারমালিক যে পরিমাণ শেয়ার ক্রয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি দেন সে পরিমাণ অর্থের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

৯. কোম্পানি ব্যবসায়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়। শেয়ারমালিকগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিয়ে পরিচালনা পরিষদ নিয়োগ করেন এবং পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবসায় পরিচালিত হয়।

কর্মপত্র-১ : যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করে এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো চিহ্নিত কর

কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা	কোম্পানি সংগঠনের অসুবিধা
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠনের প্রকারভেদ (Classification of Join Stock Company)

বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক দিকের বহুবিধ পরিবর্তন ও উন্নয়নের ছোঁয়া ব্যবসায় জগৎকে স্পর্শ করে। যার কারণে একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে বৃহদায়তন ব্যবসায় হিসেবে যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়। যৌথ মালিকানাধীন যত রকমের ব্যবসায় সংগঠন আছে তার মধ্যে কোম্পানির সংগঠন সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বাংলাদেশের কোম্পানি সংগঠনগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ক. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

ক. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি (Private Limited Company)

যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জনে সীমাবদ্ধ এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে বলা হয়েছে, 'প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলতে এমন কোম্পানিকে বোঝায় যার সদস্য সংখ্যা ৫০ জনে সীমাবদ্ধ, সদস্যদের শেয়ার হস্তান্তর অধিকার সীমিত এবং শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য জনগণের নিকট আমন্ত্রণ জানানো নিষিদ্ধ' অর্থাৎ কোম্পানির সদস্যগণ শুধু নিজেরাই শেয়ার ক্রয় করতে পারেন। সদস্য সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ সীমিত হওয়ার কারণে এ জাতীয় কোম্পানির আয়তন তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। আইন অনুযায়ী এ কোম্পানির পরিচালকের সংখ্যা ন্যূনতম ২ জন হতে হবে। বাংলাদেশে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (Public Limited Company)

যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন ও সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কোম্পানির স্মারকলিপিতে উল্লিখিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং শেয়ার ও ঋণপত্র জনগণের নিকট বিক্রি করা যায় এবং শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রয়োজনে স্মারকলিপিতে সংশোধনী এনে শেয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। আইন অনুযায়ী এ কোম্পানির ন্যূনতম ৩ জন পরিচালক থাকতে হবে।

কর্মপত্র-২ : প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে ৫টি পার্থক্য বের কর	
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের গুরুত্ব (Importance of Joint Stock Company)

বর্তমান ব্যবসায় জগতে একমালিকানা ব্যবসায়ের মতো যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি ব্যবসায়ও দেশে দেশে খুব জনপ্রিয়। তাছাড়া বৃহদায়তনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কোম্পানি সংগঠন সবচেয়ে বেশি উপযোগী। কর্মসংস্থানের সাথে সাথে শুধু বেকারত্বই দূর হয় না, জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হয় এবং মাথাপিছু আয় বাড়ে। আবার একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ে ঝুঁকি এবং দায় অসীম হওয়ার কারণে বড় আকারের ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ সম্ভব হয় না যা সম্ভব হয় কোম্পানি সংগঠনে। তাছাড়া উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে কোম্পানি সংগঠনই বেশি উপযুক্ত। কারণ এ ধরনের ব্যবসায় সংগঠন ও শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিশাল পরিমাণ মূলধন ও অর্থের প্রয়োজন হয় তা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলো জনগণের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে পারে। ফলে দেশের শিল্প উন্নয়ন বিকাশে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। কোম্পানি সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি পায় ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও সুদৃঢ় হয়। বর্তমানে বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানি বিশ্বব্যাপী তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করে। আমাদের দেশেও বাটা সু লিমিটেড, ইউনিলিভার ইত্যাদি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এভাবে এক দেশের কোম্পানি অন্য দেশে শাখা খুলে কাজ করার মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক সম্পর্কও গড়ে উঠে। বাংলাদেশে বিগত দুই দশক যাবত অনেকগুলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

কর্মপত্র-৩

বাংলাদেশে কর্মরত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা তৈরি কর	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের গুরুত্ব চিহ্নিত কর
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

কোম্পানির গঠন প্রক্রিয়া (Process of Formation of a Company)

বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে কতকগুলো ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোম্পানি গঠন করতে হয়। কোম্পানি গঠন প্রক্রিয়াটি সাধারণত চারটি ধারাবাহিক পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। সেগুলো হলো–

ক. উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়

এ পর্যায়ে কোম্পানি গঠনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ নিজেরা একত্রিত হয়ে কোম্পানির সম্ভাব্য নাম, কোম্পানির ধরন, মূলধনের পরিমাণ, মূলধন সংগ্রহের উপায়, কোম্পানির ঠিকানা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় সংগঠনের সম্ভাব্য নাম স্থির করে নিবন্ধকের অফিস থেকে সে নামে ছাড়পত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন।

খ. দলিলপত্র প্রণয়ন পর্যায়

এ পর্যায়ে কোম্পানির পরিচালকগণ কোম্পানি ব্যবসায়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়ন করেন। একটি হলো স্মারকলিপি এবং অন্যটি হলো পরিমেল নিয়মাবলি। স্মারকলিপিকে কোম্পানির মূল দলিল, সনদ বা সংবিধান বলা হয়। এতে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন কোম্পানির নাম, নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ, শেয়ারমালিকদের দায়-দায়িত্ব, ন্যূনতম চাঁদা ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে পরিমেল নিয়মাবলিতে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়।

গ. নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ পর্যায়

এ পর্যায়ে কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের অফিস থেকে ফি দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হয়। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত ফি ও প্রয়োজনীয় দলিলপত্র নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়। নিবন্ধক নির্ধারিত আবেদনপত্র, সকল দলিলপত্র ও ফি পাওয়ার পর যদি সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট হন তবে নিবন্ধন বইতে কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং নিবন্ধনপত্র প্রদান করেন। এ পত্র পাওয়ার পর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে তবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কাজ শুরু করার জন্য নিবন্ধকের নিকট থেকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়।

ঘ. কার্যারম্ভ পর্যায়

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য ন্যূনতম চাঁদা (Minimum Subscription) সংগ্রহের ঘোষণাপত্র এবং জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের ঘোষণাপত্রসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রসহ আবেদন করতে হয়। সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে এবং সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রদান করেন। এ পত্র পাওয়ার পরেই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

সমবায় সমিতির ধারণা (Concept of Cooperative Society)

সমবায়ের শাব্দিক অর্থ হলো সম্মিলিত উদ্যোগে বা প্রচেষ্টায় কাজ করা। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও চিন্তা থেকেই সমবায়ের উৎপত্তি। শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিনির্ভর বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠনের বিকাশের ফলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিত যত মজবুত হতে থাকে, এর প্রভাবে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যও দেখা দিতে থাকে। স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে দূরবস্থার সম্মুখীন হতে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজের সৃষ্ট এ জাতীয় অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দূরবস্থা থেকে মুক্তির প্রয়াসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায় সংগঠন গড়ে উঠে। সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয় পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপানে। তবে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রপথিক সংগঠন হচ্ছে ১৮৪৪ সালে উত্তর ইংল্যান্ডের রচডেল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত রচডেল সমবায় সমিতি (Rochdale Equitable Pioneers Society)। ২৮ জন তাঁত শ্রমিকের ২৮ স্টার্লিং পাউন্ড পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ সমবায় সমিতিকে বিশ্বের সর্বপ্রথম সমবায় ব্যবসায় হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সমিতির সদস্যদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল

না। তারা তাদের স্বল্প বেতন দিয়ে উচ্চমূল্যের খাদ্যসামগ্রী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে সক্ষম ছিল না। সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ময়দা, চিনি জাতীয় ,খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করে কম দামে নিজেদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন।

বিশ্বের সর্বপ্রথম সমবায় সমিতি রচডেল সমিতি 'The Rochdale Pioneers Equitable Society' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডের রচডেল নামক স্থানে ।

নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতা, পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং সততাকে তারা এ ব্যবসায় পরিচালনার নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবেই সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু হয়।

আমাদের এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ১৯০৪ সালে সরকারিভাবে সমবায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯১৮ সালে কলকাতায় বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৯ সালে প্রখ্যাত সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা ড. আক্তার হামিদ খানের নেতৃত্বে কুমিল্লায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমবায় সমিতি আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে জাতীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সমবায় সমিতি হচ্ছে দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের সমবায় সংগঠন 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ' যা 'মিল্ক ভিটা' নামে পরিচিত। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ মৎসজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, বাংলাদেশ অটোরিক্সাচালক সমবায় ফেডারেশন লিঃ, কুমিল্লা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেডসহ অনেক সমবায় সমিতি কাজ করছে। ২০০৯ সালের হিসাব মতে, বাংলাদেশে ১,৬৩,৪০৮টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি রয়েছে যার মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৮৫,০৫,০৩৮ জন। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল সমবায় সমিতি ২০০১ সালের সমবায় আইন এবং ২০০৪ সালের সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল ও উন্নত বিভিন্ন দেশে সমবায় একটি জনপ্রিয় ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

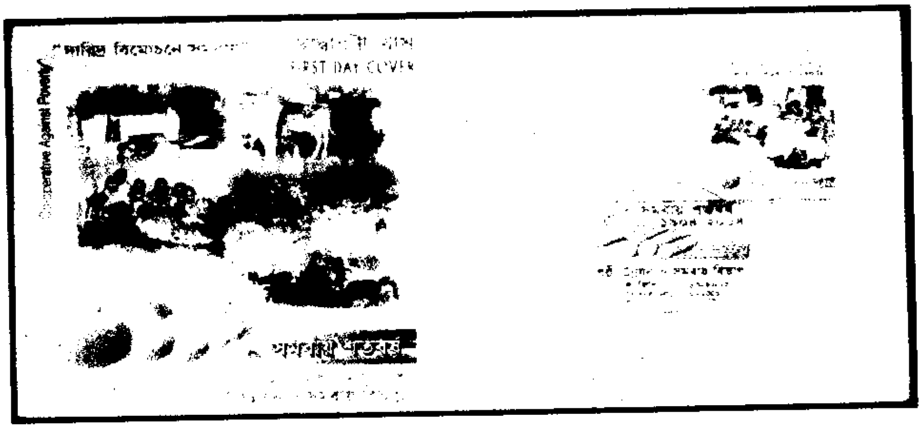

বাংলাদেশে সমবায়ের শতবর্ষের স্মারক খাম

সমবায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Cooperative Organization)

সাধারণভাবে কতিপয় নিম্ন ও মধ্যবিত্তের সমমনা ব্যক্তি নিজেদের আর্থিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। তারা সমতার ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ করে, গণতান্ত্রিকভাবে উক্ত সংগঠনটি পরিচালনা করে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে উক্ত সংগঠনের ঝুঁকি ও সুযোগ-সুবিধা ভাগ করে নিতে সম্মত হয়। সমবায় সমিতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

১. সাধারণত নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন সমমনা ও পেশার ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছামূলকভাবে এ জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলে। সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, মুনাফা অর্জন নয়।

২. ২০০১ সমবায় আইনে তিন ধরনের সমবায় সমিতির উল্লেখ আছে। সেগুলো হলো–

(ক) প্রাথমিক সমবায় সমিতি, যার সদস্য সংখ্যা হবে ন্যুনতম ২০ জন একক ব্যক্তি এবং যাহার উদ্দেশ্য হবে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। সর্বাধিক সদস্যের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

(খ) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, যার সদস্য হবে অন্তত ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং উদ্দেশ্য হবে উক্ত সদস্য সমিতিগুলোর কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।

(গ) জাতীয় সমবায় সমিতি, যার সদস্য হবে ১০টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, এবং উদ্দেশ্য হবে দেশব্যাপী উক্ত সদস্য সমিতিগুলোর কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।

৩. সমবায় সমিতি সমবায় আইনে গঠিত একটি কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট সংগঠন যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকবে, উদ্দেশ্য পূরণে যে কোনো ধরনের সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর করার এবং চুক্তি করার অধিকার থাকবে। সমিতির একটি সাধারণ সিলমোহর থাকবে এবং নিজ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং সমিতির নামেও অন্য কেউ মামলা দায়ের করতে পারবে।

৪. সমবায় সমিতির মূলধন সমমূল্যের কতকগুলো শেয়ারে বিভক্ত থাকে। সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য অন্তত একটি শেয়ার ক্রয় করে সমিতির সদস্য হতে পারবেন তবে কোনো সদস্য সমিতির মোট শেয়ার মূলধনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক শেয়ার ক্রয় করতে পারে না। সদস্যগণের দায় সাধারণত সীমিত ও শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ।

৫. ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সকল স্তরে সমবায় সমিতিকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। সকল শ্রেণির সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য সমিতির কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি মাত্র ভোট প্রয়োগের অধিকারী। উক্ত ভোট ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে প্রয়োগ করতে হয়, প্রতিনিধির মাধ্যমে কোনো ভোট দেওয়া যায় না।

৬. সমবায় আইন ২০০১ অনুযায়ী সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধিত বা অনুমোদিত না হলে কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ, সংগঠন বা সমিতি তার নামের অংশ হিসেবে সমবায় বা Cooperative শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে না। অর্থাৎ নিবন্ধন ব্যতীত 'সমবায়' শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অন্যান্য কারবারের সাথে সমবায়ের বেশ মিল থাকলেও কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে ।

সমবায় সমিতির প্রকারভেদ (Classification of Cooperative Society)

সমবায় মূলত স্বল্পবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন লোকদের সংগঠন। যদিও বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বনির্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করছে। সমবায় বিধিমালা ২০০৪-এ পেশাভিত্তিক নিম্নোক্ত সমবায় সমিতিসমূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে–

১. কৃষি বা কৃষক সমবায় সমিতি

২. মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি

৩. শ্রমজীবী সমবায় সমিতি

৪. মৃৎশিল্পী সমবায় সমিতি

৫. তাঁতি সমবায় সমিতি

৭. ভূমিহীন সমবায় সমিতি (সদস্যগণের সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ হবে ৪০ শতক)

৭. বিত্তহীন সমবায় সমিতি

৮. মহিলা সমবায় সমিতি

৯. অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, ট্যাক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক, ট্যাঙ্ক-লরি চালক সমবায় সমিতি

১০. হকার্স সমবায় সমিতি

১১. পরিবহন মালিক বা শ্রমিক সমবায় সমিতি

১২. কর্মচারী সমবায় সমিতি

১৩. দুগ্ধ সমবায় সমিতি

১৪. মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি

১৫. যুব সমবায় সমিতি (১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সী যুব ও যুব-মহিলাদের জন্য)

১৮. গৃহায়ন (হাউজিং) সমবায় সমিতি

১৯. ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি

২০. দোকান মালিক বা ব্যবসায়ী বা মার্কেট সমবায় সমিতি

সকল ধরনের সমবায় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। তবে স্বল্পবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের জন্য সমবায়ের উদ্ভব হলেও বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার বিত্তশালী ব্যক্তিও সমবায় সমিতি গঠন করার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে আশা করা যায় যে, স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার ইচ্ছুক দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবক সমবায় সমিতি গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সমবায় সমিতির গঠন প্রক্রিয়া (Formation Process of Cooperative Society)

আইনের মাধ্যমে গঠিত বলে আইনগত নিয়ম পালনের মধ্য দিয়ে সমিতি গঠন ও পরিচালনা করতে হয়। বাংলাদেশে ২০০১ সালের সমবায় আইনে সমবায় সংগঠন গঠন করতে চাইলে তিনটি পর্যায়ে সমবায় সমিতির গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ক. উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় : প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করতে চাইলে সমমনা, সমশ্রেণি, সমপেশা ও সমমর্যাদার প্রাপ্ত বয়স্ক ন্যূনতম ২০ জন মানুষ স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। এ সকল উদ্যোক্তা নিজেদের মধ্য থেকে ৬ জনকে নিয়ে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি নিবন্ধনসহ সমবায় সমিতি গঠনের জন্য একটি উপবিধি তৈরি করে। উপবিধিতে সমবায় সমিতির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধনের পূর্ণ বিবরণ, শেয়ারের মূল্যমান ও সংখ্যা, শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতি, উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা ও পদবি এবং সমিতি পরিচালনার নিয়ম উল্লেখ থাকে। সমিতির জন্য একটি সিলমোহরও তৈরি করতে হয়। সমিতি সসীম দায়বিশিষ্ট হলে নামের শেষে লিঃ কথাটি লিখতে হয়।

খ. নিবন্ধন পর্যায় : এ পর্যায়ে নিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। সমিতিটি যে এলাকায় অবস্থিত সে এলাকায় সরকার কর্তৃক মনোনীত নিবন্ধকের অফিস থেকে নিবন্ধনের আবেদন ফরম-১ সংগ্রহ করে, যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত ফিসহ প্রস্তাবিত উপ আইনের ৩ (তিন) কপিসহ নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়। সরকারি কর্মসূচির আওতায় বিত্তহীন, ভূমিহীন এবং আশ্রয়হীনদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার ট্রেজারি চালান, অন্যান্য প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ৩০০ (তিন শত) টাকার ট্রেজারি চালান, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকার ট্রেজারি চালান এবং জাতীয় সমবায় সমিতির নিবন্ধনের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার ট্রেজারি চালান আবেদনপত্রের সহিত জমা দিতে হয়। নিবন্ধনের জন্য বিভিন্ন সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় বা সরকারি কর্মসূচির আওতায় গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা, ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি ব্যতীত অন্যান্য প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা, ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকার এবং কেন্দ্রীয় সমিতি ও জাতীয় সমিতি নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পরিশোধিত শেয়ার মূলধন থাকতে হবে। আবেদনপত্রটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাগজপত্র ও নিয়মাবলিসহ সকল বিষয় সঠিকভাবে পাওয়া গেলে নিবন্ধক সমবায় সমিতির নাম তার নিবন্ধন বইতে তালিকাভুক্ত করেন এবং সমিতিকে সিলযুক্ত দুইকপি উপবিধি ও নিবন্ধন নম্বর প্রদান করেন। এভাবে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

গ. কার্যারম্ভ পর্যায় : নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর সমবায় সমিতি আইনগতভাবে অস্তিত্ব লাভ করে। নিবন্ধিত না হলে কোনো সংগঠন সমবায় কথাটি ব্যবহার করতে পারে না। নিবন্ধন প্রাপ্তির পর উক্ত সমিতির উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করতে পারে।

কর্মপত্র–৫ : একমালিকানা, অংশীদারি ও যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের সাথে সমবায় সমিতির মিল ও অমিলগুলো চিহ্নিত কর	
মিল	অমিল
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

সমবায় সমিতির মূলনীতি (Basic Principles of Cooperative Society)

অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে ভিন্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায় সংগঠন গড়ে উঠে। সাধারণত সমশ্রেণি ও সমপেশাভুক্ত নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন সমাজের মানুষেরা প্রথমত নিজেদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এ ধরনের সংগঠন গড়ে তোলে। নিচে সমবায়ের নীতিগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

১. সমবায়ের প্রধান নীতিই হচ্ছে সমমনা, সমপেশা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমশ্রেণির লোকদের একতা। মূলত একতাই বল (Unity is strength) নীতির ভিত্তিতে এ ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়েছে।

২. সমবায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো সাম্য বা সকলের সমান অবস্থান ও অংশগ্রহণ। এর সদস্যগণ অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে যেমনই হোক না কেন সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী।

৩. সমবায়ের আরেকটি নীতি ও মূল্যবোধ হলো সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতা। সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ও সহানুভূতি সমবায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমবায়ের সাফল্যের চাবিকাঠি।

৪. সদস্যদের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস সমবায়ের সাফল্যের আরেককটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। সদস্যদের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস তাদেরকে উদ্যমী, আগ্রহী ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

৫. সমবায়ের আরেকটি মৌলিক আদর্শ হলো এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনা। সমবায় সমিতিতে সকলের ভোট প্রয়োগের অধিকার আছে এবং প্রত্যেকের একটি ভোট থাকে। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ সদস্যদের মধ্যে কম-বেশি থাকলেও ভোটাধিকার প্রয়োগ ও মতামত প্রকাশে সকলের সমান সুযোগ আছে।

বাংলাদেশে সমবায় ব্যবসায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা (Problems and Prospects of Cooperative Society in Bangladesh)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায়, এখনও এ দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ কৃষি ও গ্রামভিত্তিক বিভিন্ন পেশায় যেমন– কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, মৎস চাষি, কামার, কুমার, জেলে ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন- বাঁশ ও বেত শিল্প, মৃৎশিল্প, ঝিনুক শিল্প, হস্ত শিল্প এবং বিভিন্ন ধরনের একমালিকানা ব্যবসায় যেমন- মুদি দোকান, দরজি দোকান, ঔষধ বিক্রির দোকান, সবজি বিক্রির দোকান, সেলুন, চা বিক্রির দোকান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে। অথচ তাদের বেশির ভাগই স্বল্প ও নিম্ন আয়ের। ফলে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা যেমন- শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তাদের একার পক্ষে নিজেদের উন্নতি করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে প্রাচীন চাষাবাদ পদ্ধতি, মূলধনের স্বল্পতা, উন্নত সার, বীজ ও কীটনাশকের অভাব, খণ্ড খণ্ড কৃষি জমি ইত্যাদি কারণে এ দেশের অর্থনীতির প্রাণ কৃষক ও কৃষি তাদের যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না। আবার

নিজেদের মধ্যে একতা, সহযোগিতা ও আস্থা না থাকার কারণে বিভিন্ন দালাল শ্রেণির লোকদের দ্বারা নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এ সকল স্বল্প ও নিম্নবিত্তের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে সমবায় সংগঠন। সমমনা ও সমশ্রেণির ঐ সকল গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে অনেক সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়েছে যারা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নেও অবদান রাখছে। কিন্তু দেশের এবং সমাজের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে সকলকে বিশেষ করে যুবসমাজকে সমবায়ের দিকে উৎসাহিত করতে হবে।

কর্মপত্র-৬

তোমাদের এলাকার কৃষকদেরকে সমবায় সংগঠন করার জন্য তোমরা কীভাবে উৎসাহিত করতে পার?	পড়াশুনা শেষ করে তুমি কীভাবে নিজেকে সমবায় সংগঠন করতে উৎসাহিত করবে?
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা (Concept of the State enterprise)

সাধারণ অর্থে সরকার কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। এরূপ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আবার ব্যক্তিমালিকানাধীন যে কোনো ব্যবসায়কে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করতে পারে। সাধারণত দেশে অধিক শিল্পায়ন, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদের সুষম বণ্টন ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ কিছু জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে রাষ্টীয়ভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া দেশরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র নির্মাণ শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় বেশ কিছু ব্যবসায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Charecteristis of the State Enterprise)

অন্যান্য ব্যবসায়ের চেয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বেশকিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হলো।

- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সাধারণত রাষ্ট্র প্রধানের অধ্যাদেশ বা জাতীয় সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে গঠিত হয়। তাছাড়া সরকারি অধ্যাদেশের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করনের মাধ্যমেও এরূপ ব্যবসায় গঠন করা যায়।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকে ও সকল মূলধন সরকারই সরবরাহ করে থাকে। তবে সরকার কোনো কোনো অবস্থায় জনগণের নিকট আংশিক শেয়ার বিক্রি করতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন যোগানদাতা সরকার ও জনগণ।

- বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত হয় বলে এ জাতীয় ব্যবসায় কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী।
- অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো মুনাফা অর্জন বা বৃদ্ধি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য নয়। জনসেবা বা জনকল্যাণই এ জাতীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ে লাভ হলে তা সরকারি তহবিলে জমা হয় এবং জনকল্যাণে ব্যয় হয়। আবার লোকসান হলে তা সরকারকেই বহন করতে হয়।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য সরকারকে জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

কর্মপত্র–৭ : ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত কর
• • • • • • • • •

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় (State Enterprises of Bangladesh)

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর নতুন সরকার জনকল্যাণমুখী, সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেকগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক, আর্থিক ও বিমা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় মালিকানায়ও বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। পরবর্তীতে অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিলেও এখনও অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের বেশ কিছু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের নাম, ধরন ও সেগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীণ মন্ত্রণালয়ের নাম একটি তালিকায় দেওয়া হলো–

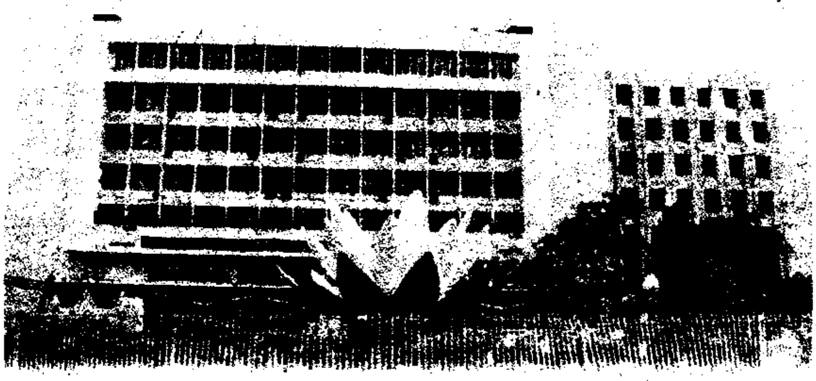

বাংলাদেশ ব্যাংক

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের নাম	ব্যবসায়ের ধরন	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের নাম
• বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা	শিল্প	শিল্প
• বাংলাদেশ পাটকল শিল্প সংস্থা	শিল্প	শিল্প
• বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সেবা শিল্প	জ্বালানি ও খনিজ
• বাংলাদেশ ব্যাংক	ব্যাংকিং	অর্থ
• বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা	পরিবহন	যোগাযোগ
• বাংলাদেশ রেলওয়ে	পরিবহন	যোগাযোগ
• বাংলাদেশ পর্যটন সংস্থা	সেবা	বিমান ও পর্যটন
• বাংলাদেশ বিমান	পরিবহন	বিমান ও পর্যটন
• বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ সংস্থা	পরিবহন	যোগাযোগ
• বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা	শিল্প	শিল্প
• বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা	সেবা	টেলিযোগাযোগ
• বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, গাজীপুর	শিল্প	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
• বাংলাদেশ টেলিভিশন	সেবা	তথ্য
• বাংলাদেশ বেতার	সেবা	তথ্য
• তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি:	সেবা	জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয়
• জীবন বিমা কর্পোরেশন	জীবন বিমা	অর্থ

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় সংগঠন কোনটি?

ক. অংশীদারি খ. একমালিকানা

গ. সমবায় ঘ. যৌথ মূলধনী

২। অংশীদারি ব্যবসায়ে কখন আস্থা সংকট দেখা দেয়?

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হলে খ. চুক্তি লিখিত না হলে

গ. মুনাফা কম হলে ঘ. পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রসুলপুর গ্রামের দরিদ্র গৃহবধূরা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। স্থানীয় এনজিও থেকে কিছু ঋণ নিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্প তৈরি করে শহরে বিক্রয় করেন। একদিন তাদেরই একজন সদস্য শহরে পণ্য নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় পড়লে সম্পূর্ণ পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তারা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হলেও পরবর্তীতে সকলে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে তাদের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখেন।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমিতিটি কোন সমিতির অন্তর্ভুক্ত?

ক. বিত্তহীন খ. ভূমিহীন

গ. ব্যবসায়ী ঘ. কৃষি

৪। উল্লিখিত সমিতিটি সফল হওয়ার কারণ-

i. পারস্পরিক আস্থা

ii. সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব

iii. গণতান্ত্রিক মনোভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিম্নবিত্ত পরিবারের বড় সন্তান আবির যখন এসএসসি পাস করে সে সময়ে হঠাৎ তার বাবা মারা যায়। ফলে সংসারের দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ে। এতে তার লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটে। ফলশ্রুতিতে আবির কিছু টাকা ধার করে কালীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের কাছে ছোট একটি চায়ের দোকান খুলে কর্মজীবন শুরু করেন।

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

খ. একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের ১টি পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

গ. আবিরের ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব কেমন হবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাংগঠনিক ধরন বিবেচনায় আবিরের ব্যবসায়টি 'কম ঝুঁকিপূর্ণ' অথচ অসীম দায়সম্পন্ন— উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও।

২। নাফিজ ও তার চার বন্ধু চুক্তির ভিত্তিতে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ায় দিন দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে সমস্যা হচ্ছে। তাই তারা সংগঠনের ধরন পরিবর্তন করে ১৯৯৪ সালের আইনানুযায়ী 'নাফিজ এন্ড ফ্রেন্ডস' কোং লিঃ নামে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধন করে বৃহৎ পরিসরে কাজ শুরু করেন। ২ বছরের মধ্যে তারা দুইটি বিভাগীয় শহরে তাদের শাখা খুলে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন।

ক. ব্যবসায় সংগঠন কত প্রকার?

খ. একমালিকানা ব্যবসায় 'মালিকের দায় অসীম' কথাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. নাফিজ ও তার বন্ধুদের ১ম পর্যায়ের ব্যবসায় সংগঠনটি কী ছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাংগঠনিক ধরন পরিবর্তন করায় নাফিজদের প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনীতিতে আরও বেশি ভূমিকা রাখবে– বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যবসায়ের আইনগত দিক

Legal Aspects of Business

জীবিকা অর্জন ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কোনো ব্যবসায় করার অধিকার সকলের রয়েছে। তবে সকল ব্যবসায় দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত ও বৈধ হতে হয়। এ অধ্যায়ে ব্যবসায়ের বিভিন্ন আইনগত দিক যেমন লাইসেন্স, ট্রেড মার্কস, ফ্র্যানসাইজ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারব।

Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT)

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- ব্যবসায়ের আইনগত দিকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লাইসেন্সের ধারণা ও এটি পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- ফ্র্যানসাইজের ধারণা ও এটি পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- পেটেন্টের ধারণা, নিবন্ধনকরণ ও সুবিধাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- ট্রেড মার্কের ধারণা ও ধরন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ট্রেড মার্ক নিবন্ধন করার পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব।
- কপিরাইটের ধারণা ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কপিরাইট নিবন্ধন করার সুবিধা বর্ণনা করতে পারব।
- কপিরাইট ভঙ্গ করার পরিণতি বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিমার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিমার প্রকারভেদ ও বিমা করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।

ব্যবসায়ের আইনগত দিক (Legal Aspects of Business)

১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ব্যবসায় উদ্যোগ কোর্সটি মাধ্যমিক পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের একজন শিক্ষকের উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয় এবং তিনি এটি বাজারজাত করেন। এই বিষয়ের শিক্ষার্থীরা বইটি হাতে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। ফলে ৩য় সংস্করণে ছাপানো বইটি ৮০০০ কপি অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। ৪র্থ সংস্করণে লেখক ৪০০০ কপি বই ছাপিয়ে বাজারে ছাড়েন কিন্তু বইটির বিক্রয় আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, বাজারে নকল বই এসে গেছে যার দাম অপেক্ষাকৃত কম। বইটির লেখক উপায়ান্তর না দেখে নিকটবর্তী থানায় গেলেন। থানা কর্তৃপক্ষ বইটির কপিরাইট নিবন্ধিত আছে কিনা জানতে চাইলেন। যদিও নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখক অবগত ছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কপিরাইট করা থেকে বিরত ছিলেন। থানা কর্তৃপক্ষ এ কথা জেনে কোনো সাহায্য করতে অপারগ বলে দুঃখ প্রকাশ করে। পরিণামে লেখক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং পরবর্তীতে বইটি পুনঃপ্রকাশের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

উপরোউক্ত গল্পটি পাঠ করে তোমরা কী বুঝলে?

লেখক যদি কপিরাইট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বইটির কপিরাইট নিবন্ধন করে রাখতেন তাহলে তিনি কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতেন না। ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ থাকে যেমন কপিরাইট, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি। এগুলো ব্যবসায় উদ্যোগের গবেষণার ফসল এবং ব্যবসায়ের অতিমূল্যবান সম্পদ। এসব সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সব দেশেই আইনগত বিধি বিধান রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আইন কানুন সম্পর্কে ধারণা ব্যবসায়ের আইনগত সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

১. লাইসেন্স (License)

যে কোনো ব্যবসায় শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয় বা নিবন্ধন করতে হয়। অনুমোদন বা নিবন্ধন করার পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের। একক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যদি এর অবস্থান পৌর এলাকার ভিতরে হয় তাহলে পৌর কর্তৃপক্ষের এবং পৌর এলাকার বাইরে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারগণ ইচ্ছা করলে অংশীদারি আইনে উল্লিখিত নিয়মানুসারে নিবন্ধন ফরম পূরণ করে নিবন্ধনের জন্যে স্থানীয় নিবন্ধকের কাছে অবেদন করতে পারে। আবেদনের ফরমের সাথে নিদিষ্ট হারে নিবন্ধন ফি জমা দিতে হয়।

যৌথ মূলধনী কোম্পানি নিবন্ধন

কোম্পানি আইন অনুসারে বাংলাদেশে যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। এ ক্ষেত্রে কোম্পানির নিবন্ধকের ভূমিকা পালন করেন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। প্রবর্তকগণ কোম্পানি আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় দলিলসহ ফি প্রদান করে নিবন্ধকের নিকট আবেদন করেন। দলিলাদি ও প্রমাণপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধক নিবন্ধনপত্র ইস্যু করেন। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার সাথে সাথে কোম্পানি জন্ম লাভ করে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম দুইজন প্রবর্তককে এবং পাবলিক কোম্পানির বেলায় সাতজন প্রবর্তককে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার সাথে সাথে ব্যবসায় শুরু করতে পারে, কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে ব্যবসা শুরু করার জন্য কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়।

১. ফ্রানসাইজিং (Franchising)

বর্তমানে ফ্রানসাইজিং পদ্ধতিতে ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কোনো খ্যাতনামা কোম্পানির নাম ব্যবহার এবং এর পণ্য তৈরি, বিক্রি বা বিতরণ করার অধিকারকে ফ্রানসাইজিং বলে। এ ধরনের ব্যবসার উদাহরণ হলো ব্যান্ড বক্স কোম্পানি, পিজ্জাহাট, কেএফসি ইত্যাদি। ফ্রানসাইজিং ব্যবসায় দুটি পক্ষ থাকে, ফ্রানসাইজর ও ফ্রানসাইজি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার কেএফসি হচ্ছে ফ্রানসাইজর এবং বাংলাদেশের স্ট্রান্সকম লিঃ হচ্ছে ফ্রানসাইজি। ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো :

১) ফ্রানসাইজর ও ফ্রানসাইজি-এর মধ্যে চুক্তিপত্র।

২) ব্র্যান্ডেড পণ্য বা সেবা

৩) পণ্য বা সেবা স্বীকৃত মান ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য ফ্রানসাইজার কর্তৃক মনিটরিং।

ফ্রানসাইজ চুক্তি

ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ফ্রানসাইজিং চুক্তি যা ফ্রানসাইজি ও ফ্রানসাইজারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। পুঁজির পরিমাণ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনায় সাহায্য, ফ্রানসাইজ এলাকা ইত্যাদি ভেদে চুক্তির ধারাগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে সকল ফ্রানসাইজিং চুক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে :

ক. ফ্রানসাইজি প্রথমে নির্দিষ্ট অঙ্কের ফি এবং পরে বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে মাসিক ফি প্রদান করে। প্রতিদিনের হিসেবে ফ্লানসাইজি ফ্রানসাইজারের পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের অধিকার পায়।

খ. ফ্লানসাইজি অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিনিয়োগ করতে রাজি থাকবেন।

গ. উভয় পক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য থাকবে ব্যবসা থেকে অর্থ উপার্জন। আয়ই হবে ব্যবসার সাফল্য নির্ধারণের মাপকাঠি । সফল হতে হলে ব্যবস্থাপনা হতে হবে দক্ষ, পণ্য বা সেবা হতে হবে উত্তম ।

ঘ. ফি প্রাপ্তির দিন থেকেই ফ্রানসাইজার আয় করতে থাকবে। কোনো কোনো সময় ফ্রানসাইজির কার্য অধিকার দেওয়ার আগেই ফ্রানসাইজার ফি দাবি করতে পারে।

ঙ. চুক্তিতে কোনো কোনো সময় ফ্লানসাইজার নিজেই ব্যবসা এলাকা নির্ধারণ, অবকাঠামো নির্মাণ এবং এসবের মালিকানা নিজের কাছে রাখতে পারে।

চ. ব্যবসা যদি ফ্রানসাইজরের মানদণ্ড অনুযায়ী সফল না হয় তাহলে যে কোনো সময় চুক্তিপত্র বাতিল করে দিতে পারে।

ছ) ফ্রানসাইজি শুধু ঐ আইটেমসমূহ বিক্রয় করতে পারবে যা ফ্রানসাইজর গ্রহণযোগ্য মনে করে।

চুক্তিপত্রের শর্তাবলি যদি উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে।

ফ্রানসাইজিং প্রতিষ্ঠানের আইনগত ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী নিবন্ধন করে ব্যবসা শুরু করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয় তাহলে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কাছ থেকে নিবন্ধন করে বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করতে পারবে।

ফ্রানসাইজিং বা লাইসেনসিং-এর মাধ্যমে ব্যবসায় শুরু করার অনেকগুলো সুবিধা আছে। এগুলোর মধ্যে ব্র্যান্ডের পণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ফ্রানসাইজরের কাছ থেকে ব্যবসায় সংক্রান্ত পরামর্শ নেওয়া এবং যে কোনো সময় অর্থায়নের ব্যবস্থা অন্যতম। অসুবিধাগুলোর মধ্যে কড়া মনিটরিং, চুক্তিপত্রের উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গের জন্য চুক্তি বাতিলের সম্ভাবনা এবং বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ অন্যতম। এসত্ত্বেও ফ্রানসাইজিং ব্যবস্থা নতুন নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। বিদেশে এ জাতীয় ব্যবসায় জনপ্রিয়তা লাভ করলেও বাংলাদেশে এখনও তেমন জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি লাভ করেনি। বড় বড় শহরের পাশাপাশি জেলা শহরগুলোতে এগুলোর শাখা বৃদ্ধি করলে ধীরে ধীরে এর প্রসার বাড়বে।

১. মেধাসম্পদ (Intellectual Property)

মনন ও মেধা দ্বারা সৃষ্ট কাজই মেধাসম্পদ। ব্যবসায়, শিল্পে বা বাণিজ্যে প্রয়োগ উপযোগী আবিষ্কার, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম, নকশা, প্রতীক, নাম ইত্যাদি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত। শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোক্তার মেধাসম্পদ বলতে ঐসব মূল্যবান সম্পদকে বোঝায় যা সে দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে উদ্ভাবন করেছে। সব উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে মেধাসম্পদ। মেধাসম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষ জয় করেছে সৃষ্টির অনেক অজানা রহস্য। সম্ভব করে তুলেছে অনেক অসম্ভবকে। এসব সম্পদের মধ্যে পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক এবং কপিরাইট অন্যতম। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হয়।

২. পেটেন্ট (Patents)

পেটেন্ট হলো এক ধরনের মেধাসম্পদ। পেটেন্টের মাধ্যমে এরূপ আবিষ্কারের জন্য আবিষ্কারককে তার স্বীকৃতিস্বরূপ একটি নিদির্ষ্ট সময়ের জন্য একচেটিয়া মালিকানা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক ও সরকারের মধ্যে চুক্তি হয়। আবিষ্কারককে পেটেন্টটি প্রদানের অর্থ হলো এই নির্দিষ্ট সময়ে অন্য কেউ এটি তৈরি, ব্যবহার এবং বিক্রয় করতে পারবে না। অনেক সময় কোন অসাধু ব্যবসায়ী বা প্রতিযোগী বিধি লঙ্ঘন করে নকল পণ্য বাজারে বিক্রয় করে উদ্ভাবনকারীকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পেটেন্ট করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিল্পোদ্যোক্তার পরিশ্রমলব্ধ উদ্ভাবন নকল বা অন্য কোনো উপায়ে তৈরি বা বিক্রি করে যাতে আর্থিক সুবিধা অর্জন না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। ব্যবসায় জগতে প্রকৃত উদ্ভাবক এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে পেটেন্ট ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। বস্তুত এ বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা সচেতনতার অভাব বা অবহেলার কারণে অনেক সময় প্রতারিত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯১১ সালের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন চালু আছে।

৩. পণ্য প্রতীক/ট্রেডমার্ক (Trademark)

ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো পণ্যকে অন্যের অনুরূপ বা অভিন্ন পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতীককে ট্রেডমার্ক বলে। ঠিক একই উদ্দেশ্যে সেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতীককে সার্ভিস মার্ক বলে। স্বাতন্ত্র্যতাই মার্ক বা প্রতীকের মূল বিষয়। ডিভাইস (device), ব্রান্ড (brand), শিরোনাম (Heading), লেবেল (label), টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ,

অক্ষর, প্রতীক, সংখ্যা যুক্ত উপাদান, রঙের এর সমন্বয় বা এগুলোর যে কোনো রূপ সমন্বয় প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত হবে। মোড়ক প্রতীকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

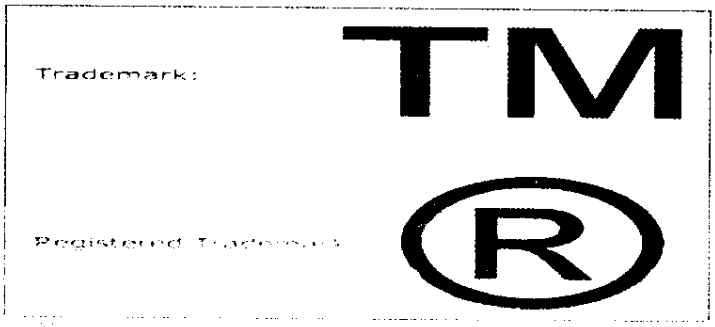

ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Trademark Registration)

কোনো প্রতীক বা মার্কের রেজিস্ট্রেশন ঐ পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে প্রতীকটি ব্যবহারের বিষয়ে রেজিস্টার্ড মালিককে একচ্ছত্র স্বত্ব বা অধিকার প্রদান করে। রেজিস্টার্ড মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঐ প্রতীকটি ব্যবহার করতে পারবে না। রেজিস্টার্ড মার্কটি সুপরিচিত হলে অন্যান্য পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রেও মালিকের এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আইন দ্বারা এ অধিকার সুরক্ষিত। এ অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতে মামলা করে প্রতিকার পাওয়া যাবে।

ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা (Time-limit of Trademark Registration)

রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কের মালিক মার্কটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষণ করেন। রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয় ৭ বছরের জন্য। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে আবেদন করলে ১০ বছরের জন্য নবায়ন করা যায়। অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ নবায়ন করা যেতে পারে। নবায়ন না করলে, শর্ত লঙ্ঘিত হলে বা কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়। উপমহাদেশে ১৯৪০ সালে ট্রেডমার্কস আইন প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯ চালু আছে।

১.কপিরাইট (Copyright)

কপিরাইটও একটি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ যা রক্ষা করার ব্যবস্থা না করলে এর স্বত্বাধিকারী বা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কপিরাইটের মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধাসম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়। গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা জাতীয় সাহিত্যকর্ম, চিত্রকর্ম, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকলা কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয়। বর্তমানে কম্পিউটার সফটওয়্যারও কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যখন কোনো পুস্তকের লেখক এবং প্রকাশকের মধ্যে বইটি মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি হয় একেই কপিরাইট চুক্তিপত্র বলা হয়। চুক্তিপত্রে সময়, রয়েলটির পরিমাণ প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রি করা থাকলে চুক্তি ভঙ্গের জন্য লেখক কোর্টে প্রতিকার চাইতে পারে। ব্র্যান্ডের পণ্য, খেলা, তারকাদের নাম প্রভৃতি কপিরাইট চুক্তির মাধ্যমে বিপণন করা যায়। প্রকৃত পক্ষে কপিরাইট চুক্তি পণ্য বাজারজাতকরণের একটি জনপ্রিয় উপায়। উপমহাদেশে ১৯১২ সালে প্রথম কপিরাইট আইন প্রণীত হয়। বাংলাদেশে কপিরাইট আইন ২০০০ প্রচলিত আছে যা সর্বশেষ ২০০৫ সালে সংশোধন করা হয়। মোট কথা মেধাসম্পদ সংরক্ষণের উপায়গুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করলে ব্যবসায় উদ্যোক্তা অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। কপিরাইট আইন ২০০৫ অনুযায়ী লেখক বা শিল্পীর জীবনকালীন ও মৃত্যুর পর ৬০ বছর পর্যন্ত কপিরাইট সংরক্ষিত থাকে।

২. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (Bangladesh Standards and Testing Institution-BSTI)

কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করতে চাইলে বা সেই বিশেষ পণ্যটিকে বাজারে প্রচলিত অনুরূপ অন্যান্য পণ্য থেকে আলাদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে প্রয়োজনবোধে সেই পণ্যের প্রতীক রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধিকরণ করতে হয়। এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বিএসটিআই। এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা। নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে এবং প্রয়োজনীয় ফি জমা দিয়ে পণ্য প্রতীক বা ট্রেড মার্ক নিবন্ধিকরণ করা যেতে পারে। তদুপরি কতিপয় নির্ধারিত পণ্যের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত মান অনুযায়ী সেই সকল পণ্য উৎপাদন করে বিএসটিআই থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সনদপত্র বা সার্টিফিকেট নিতে হয়। বিএসটিআই বাধ্যতামূলকভাবে সার্টিফিকেটের আওতাধীন পণ্যের তালিকা সংরক্ষণ করে। নির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিএসটিআই কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেশন বা লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। কোন কোন পণ্য বিএসটিআই এর বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্ক-এর আওতাধীন এবং সেই সকল পণ্যের নির্ধারিত মান কেমন তা বিএসটিআই থেকে জানা যায়। উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিএসটিআই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

৩. বিমা (Insurance)

কোনো না কোনো কারণে ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনাকে ব্যবসায় ঝুঁকি বলে। ঝুঁকি ছাড়া কোনো ব্যবসায় হয় না। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে ঝড়, বন্যা, সাইক্লোন, অতিবৃষ্টিপাত অন্যতম। এছাড়া চুরি-ডাকাতি অপহরণ, অগ্নি, নৌ, রেল ও মটর দুর্ঘটনার কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এসব ঝুঁকি পরিহার বা কমানোর ক্ষেত্রে বিমাকরণ একটি উত্তম উপায়। বিমা একটি ব্যবসায়ও বটে।

যে চুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ঘটনাজনিত ক্ষতির বা ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বিমাচুক্তি বলে। উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য বা নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের জন্য যে পক্ষ স্বীকৃত হয় তাকে বিমাকারি এবং যার ক্ষতিপূরণের জন্য বা যাকে অর্থ প্রদানের জন্য উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বিমাগ্রহীতা বলে। চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা এককালীন বা নিয়মিত কিস্তিতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিমাকারীকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলা হয়। বিমাচুক্তি যে দলিল দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে বিমাপত্র বলা হয়। বিমাপত্রে বিমার যাবতীয় শর্ত লিখিত থাকে। বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়। তবে জীবন বিমার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও বিমা ব্যবস্থা চালু আছে। ১৯৩৮ সালে উপমহাদেশে প্রবর্তিত বিমা আইন এতদিন বাংলাদেশে চালু ছিল। উক্ত আইনের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে ২০১০ সালে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিমা আইন ২০১০ নামে পরিচিত।

ব্যবসায়ে বিমার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Insurance in Business)

একজন ব্যবসায়ীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ঝুঁকি নিরূপণ। পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে বহুবিধ ঝুঁকি বিদ্যমান। যেমন কোনো জিনিসের ভৌতিক ক্ষতি, চুরি, কর্মচারীদের পীড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনা, আগুন, জাহাজ ডুবি ইত্যাদি ঘটনার কারণে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিমাকারি প্রতিষ্ঠান বিমাকৃত ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিতে উল্লিখিত প্রদত্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এই জাতীয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। ব্যবসার জন্য তাই বিমা অত্যন্ত সহায়ক। বিমা বিমাকারী প্রতিষ্ঠান না থাকলে ঝুঁকির আশঙ্কায় অনেক ব্যবসায়ীকেই

প্রাথমিক পর্যায়েই তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হতো। তাই ব্যবসায়ের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা ও বিরাজমান অনিশ্চয়তা দুর করে ব্যবসায়কে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার জন্য বিমার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি।

বিমার প্রকারভেদ (Classification of Insurance)

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার বিমার প্রচলন হয়েছে। এর মধ্যে চার প্রকার বিমা সর্বাধিক প্রচলিত। ১. জীবন বিমা, ২. নৌ বিমা, ৩. অগ্নি বিমা এবং ৪. দুর্ঘটনা বিমা। বর্তমানকালে মানুষ ক্রমশই বিমার সুবিধা উপলব্ধি করায় উপরোক্ত চার প্রকার বিমা ছাড়াও আরো কয়েক শ্রেণির বিমার প্রচলন হয়েছে, যেমন চৌর্য বিমা, বিশ্বস্ততা বিমা, দাঙ্গা বিমা, দায় বিমা, মোটর গাড়ি বিমা, শস্য বিমা ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি বিমার উপর আলোকপাত করা হলো–

জীবন বিমা (Life Insurance)

বিমা ব্যবসায়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জীবন বিমা। যে বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমা কিস্তির বিনিময়ে বিমা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বা তার নির্বাচিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে একটি বিশেষ সময়ের পরে বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করে থাকে সেই বিমা চুক্তিকেই জীবন বিমা বলে। এ বিমার বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের জীবন। যেহেতু মানুষের জীবনের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না, তাই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় না।

অগ্নি বিমা (Fire Insurance)

যে বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমা গ্রহীতা ব্যক্তিকে অগ্নিজনিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান করা হয় তাকে অগ্নি বিমা বলে। সাধারণত পণ্য, ঘরবাড়ি, গুদাম, কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষার জন্য অগ্নি বিমা করা হয়।

নৌ বিমা (Marine Insurance)

যে বিমায় নদী ও সামুদ্রিক যাত্রা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাকে নৌ বিমা বলা হয়। সারা পৃথিবীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকাংশ পণ্যই নৌপথে পরিবাহিত হয়। তাই নৌপথে বিরাজমান ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঢেউ, সুনামি, দস্যুতা, যুদ্ধ-বিগ্রহসহ সকল প্রকার ঝুঁকি এড়াতে নৌ বিমা করা হয়।

দুর্ঘটনা বিমা (Accident Insurance):

ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তি বিনাশের ঝুঁকি দুর্ঘটনা বিমার অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় বিমার শর্তানুসারে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের পরিবর্তে আশঙ্কিত দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

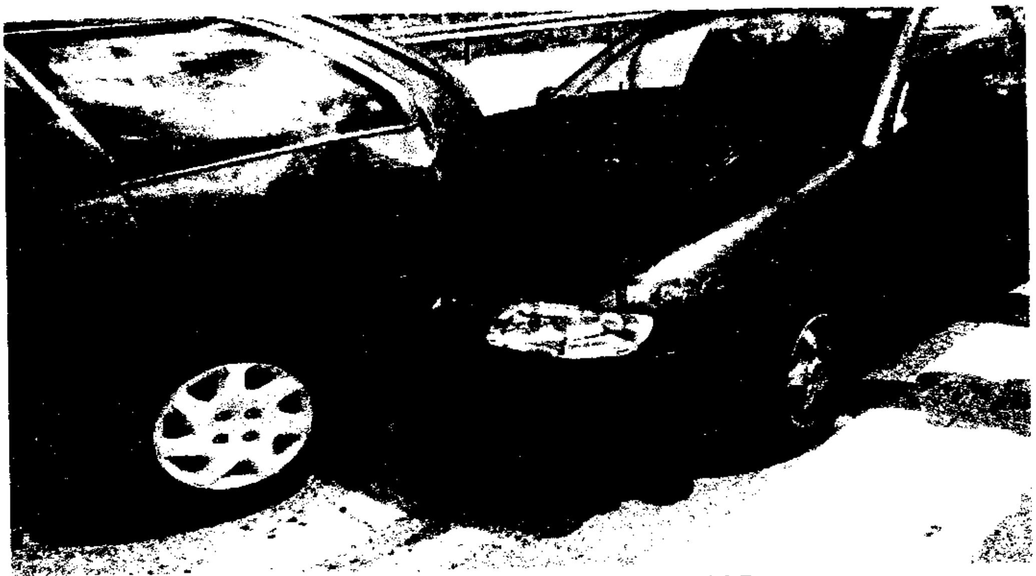

www.shutterstock.com · 20441605

উপরোক্ত ব্যবসা সংক্রান্ত আইনগত কার্যক্রম ছাড়া আরও বেশ কিছু আইন রয়েছে যা একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার জানা থাকলে ব্যবসা পরিচালনা সহজতর হয়। বিশেষ করে শ্রমিক নিয়োগসংক্রান্ত আইন, কারখানা আইন, ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবেলা আইন এবং ব্যাংকিং আইন সম্পর্কে জ্ঞান ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুকূল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ফ্রানসাইজিং ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

ক. উৎপাদন   খ. বাজারজাতকরণ
গ. মুনাফা অর্জন   ঘ. চুক্তি

২। ব্যবসায়ে পণ্যের ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করা হয় কেন?

ক. মালিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য   খ. পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে
গ. ঝুঁকি এড়ানোর জন্য   ঘ. প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঢাকার শনির আখড়ার বাসিন্দা জনাব হাবিব একটি ইলেকট্রনিক্স পণ্যসামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। এ ছাড়া তিনি বিদেশ থেকে একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নানা রকম ইলেকট্রনিক্স পণ্যসামগ্রী আমদানি করেন। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত পণ্য বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দেন. মাল আনয়নের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য একটি বিমা করা হয়।

১. উদ্দীপকে কে বিমাগ্রহীতা হবেন?

ক. উৎপাদনকারী   খ. সরবরাহকারী
গ. আমদানিকারক   ঘ. বন্দর কর্তৃপক্ষ

৪. উদ্দীপকের ব্যবসায়টি বিমা করার ফলে–

i. নির্দিষ্ট ঝুঁকি দূর হবে।
ii. সামুদ্রিক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।
iii. ক্ষতিপূরণ পাবার নিশ্চয়তা থাকবে।

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii   খ. i ও iii.
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বার্ষিক পরীক্ষার পর ইসমাম হাতিয়া থেকে ঢাকায় বেড়াতে এলো। কলেজ পড়ুয়া মামাত ভাইয়ের সাথে চিড়িয়াখানা, নভোথিয়েটার, জাতীয় জাদুঘরসহ বিভিন্ন দর্শনীয় এলাকা ঘুরে বেড়াল। ইসমাম লক্ষ করল তার ভাই যেখানে যায়, সেখানে একই নামে একটি রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করে। কারণ জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারল এটি একটি বিদেশি রেস্টুরেন্ট। বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে এটির শাখা আছে। তবে এ জাতীয় ব্যবসায় এখনও বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

ক. কত সালের ট্রেডমার্কস আইন বর্তমানে বাংলাদেশে চালু আছে?
খ. কপিরাইট বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়টি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. এ জাতীয় ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তা বাড়াতে করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

২। জনাব সবুজ একজন উদ্ভাবক। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে এমন একটি সৌরশক্তি চালিত পানি সেচের যন্ত্র আবিষ্কার করেন যেটি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সেচ যন্ত্র থেকে আলাদা। জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে এটি প্রথম স্থান অধিকার করে। তিনি এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে বাজারে ছাড়েন এবং ব্যাপক সাড়া পান। কিছুদিনের মধ্যেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার এ যন্ত্র নকল করে বাজারজাত করে। কিন্তু তিনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি।

ক. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম প্রবর্তক কত জন?

খ. লাইসেন্স বলতে কী বোঝায়? বর্ণনা কর।

গ. জনাব সবুজের পানি সেচ যন্ত্রটি কোন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব সবুজ কোনো আইনি সহায়তা না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবসায় পরিকল্পনা

Business Plan

ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করলে সাফল্য সহজতর হয় এবং ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা কমে আসে। অনেকে উৎসাহের সাথে ব্যবসায় শুরু করলেও সুষ্ঠু ব্যবসায় পরিকল্পনার অভাবে অনেক সময় সফল হতে পারে না। এ অধ্যায়ে আমরা মূলত ব্যবসায় পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

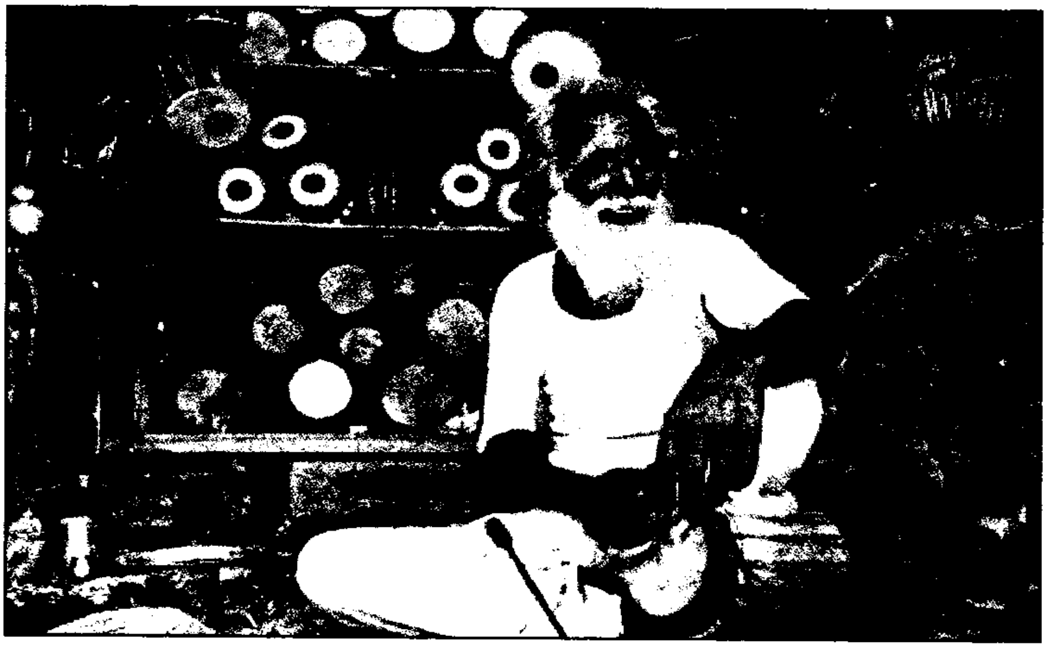

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আত্ম-বিশ্লেষণের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আত্ম-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব।
- প্রকল্প পরিকল্পনার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রকল্প প্রণয়নের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের বাছাই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক ব্যবসায়টি নির্বাচন করতে পারব।
- প্রকল্প পরিকল্পনার কাঠামো ছক তৈরি করতে পারব।

ব্যবসায় পরিকল্পনার ধারণা (Concept of Business Plan)

ব্যবসায় পরিকল্পনা হলো ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি। এটি একটি লিখিত দলিল যার মধ্যে ব্যবসায়ের লক্ষ্য, প্রকৃতি, ব্যবস্থাপনার ধারা, অর্থায়নের উপায়, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত উন্নয়নের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়। কোন ব্যবসায় কোন দিকে অগ্রসর হবে ও কীভাবে ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জন করা যাবে তার সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা ব্যবসায় পরিকল্পনায় পাওয়া যায়। জাহাজ বা উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে রাডার যেমন চালককে পথ চলার নির্দেশনা দিয়ে গন্তব্যে পৌছতে সাহায্য করে, তেমনি ব্যবসায় পরিকল্পনা কোনো ব্যবসায়ীকে তার কাংখিত লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে। নতুন ব্যবসায় শুরু করা অথবা বর্তমান ব্যবসায় সম্প্রসারণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। ব্যবসায় পরিকল্পনাকে ভ্রমণকারীর জন্য রোড ম্যাপ এবং একজন দালান নির্মাতার নীল-নকশার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব (Importance of Business Plan)

ব্যবসায় শুরু, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রধান প্রধান গুরুত্ব নিম্নরূপ–

১. **ব্যবসায় পরিচালনার দিক-নির্দেশনা** : ব্যবসায় পরিকল্পনায় ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কখন, কী কাজ, কীভাবে এবং কত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে, সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা থাকে। ফলে এটি ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তার কাছে একটি দিকনির্দেশক দলিল হিসেবে কাজ করে।

২। **মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ** : কোনো ব্যবসায়ের যখন অধিক মূলধনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং উদ্যোক্তার পক্ষে নিজস্ব তহবিল থেকে এ মূলধন যোগাড় করা সম্ভব হয় না, তখন তাকে ব্যাংক ঋণ বা অন্যান্য বাহ্যিক উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ঋণদাতা ও বিনিয়োগকারী মূলধন সরবরাহ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩. **সরকারি সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার** : ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়গুলো সরকারের নিকট থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। ব্যবসায় পরিকল্পনা এ সকল সুযোগ-সুবিধা পেতে সাহায্য করে।

৪. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা** : ব্যবসায়ের প্রতিযোগী সম্পর্কে ধারণা করা, আগামী দিনে ব্যবসায়ে কোন দিকে সম্প্রসারণ করা উচিত হবে এবং কোন ব্যবসাটি অধিকতর লাভজনক হবে এবং ভবিষ্যতে কী পণ্য উদ্ভাবন করা উচিত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবসায় পরিকল্পনা সহায়তা করে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া ব্যবসায়ের সাথে জড়িত অন্যান্য পক্ষ প্রয়োজনে ব্যবসায় পরিকল্পনা অধ্যয়ন করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া (Process of Business Plan)

ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের উপর। প্রকল্প হচ্ছে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রণীত পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত কর্ম পদ্ধতি। প্রকল্প একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়ে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পরিসমাপ্ত হয়। একটি প্রকল্প হতে পারে সম্পূর্ণ নতুন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত অথবা পুরাতন ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ। ব্যবসায় প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হলো ধারণা চিহ্নিতকরণ এবং ধারণাগুলো মূল্যায়ন করে একটিকে নির্বাচন করা।

১. প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ

একজন সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তার প্রকল্প চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় তার প্রকল্প ধারণা অনুভব করার সময় থেকেই। তিনি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো পণ্য বা সেবার চাহিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। এই চাহিদার উপর প্রকল্প নির্বাচন নির্ভর করে। সাধারণত পণ্য বা সেবা সামগ্রীর চাহিদা প্রকল্প ধারণার জন্ম দেয়। পণ্যের ধারণা থেকেই প্রকল্পের সূত্রপাত হয়। প্রকল্প ধারণা চিহ্নিত করার সময় উদ্যোক্তার নিজের শখ বা আগ্রহ আছে এমন পণ্য, প্রকৃত চাহিদা আছে এমন পণ্য, বিদ্যমান পণ্যের অসুবিধা, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নতুন প্রকল্প ধারণাগুলোর উৎসসমূহ হলো সাধারণত নিজের কল্পনা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশনা, অর্থনৈতিক ও শিল্প জরিপ প্রতিবেদন, গবেষণামূলক প্রতিবেদন ইত্যাদি।

২. ধারণা মূল্যায়ন ও প্রকল্প নির্বাচন

একজন উদ্যোক্তা বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সম্ভাব্য ধারণা চিহ্নিত করে একটি তালিকা করবেন। এ তালিকাবদ্ধ ধারণাগুলো বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচন করবেন। দুইটি পদ্ধতির মাধ্যমে চিহ্নিত ধারণাগুলো মূল্যায়ন করে প্রকল্প নির্বাচন করা যায়। এর একটি হলো ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এবং অন্যটি হলো মাইক্রোস্ক্রিনিং।

ক. ম্যাক্রোস্ক্রিনিং (Macro-Screening)

ম্যাক্রোস্ক্রিনিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যা কতকগুলো প্রভাবক বা উপাদানের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের ধারণাগুলো মূল্যায়ন করে একটি প্রকল্প ধারণা নির্বাচন করতে সহায়তা করে। সকল ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি উদ্যোক্তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কতিপয় উপাদান দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত হয়। এ প্রভাবকগুলো হলো জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত পরিবেশ।

- **জনসংখ্যা** : একটি ব্যবসায়ের অস্তিত্ব, প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতি যে এলাকায় ব্যবসায়টি অবস্থিত সে এলাকার জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে। ব্যবসায় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য বা সেবা সামগ্রীর বাজারের আকার, বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও জন্ম-মৃত্যু দ্বারা প্রভাবিত হয়।

- **অর্থনৈতিক পরিবেশ** : পণ্য বা সেবার চাহিদা ব্যবসায়টির চারদিকে বসবাসকারী ভোক্তাদের আয়, সঞ্চয়, খরচ করার প্রবণতা, জীবন যাত্রার মান ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত। প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব যথাযথভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

- **প্রাকৃতিক পরিবেশ** : সঠিক ব্যবসায় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিরাট ভূমিকা পালন করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আসে। তবে যে সব শিল্প কারখানা পরিবেশকে দূষণ করে সে সব ব্যবসায় পরিত্যাজ্য।

- **রাজনৈতিক পরিবেশ** : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের দর্শন ও রাজনীতিবিদদের আচরণ ব্যবসায় কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।

- **সাংস্কৃতিক পরিবেশ** : শিক্ষার হার, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

- **আইনগত পরিবেশ** : দেশের প্রচলিত আইন, ব্যবসায় ও শিল্পনীতি ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

ম্যাক্রোস্ক্রিনিং-এর মাধ্যমে প্রকল্প নির্বাচন একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। চূড়ান্তভাবে প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্পটির যথার্থতা আরো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর সাহায্য নেয়া প্রয়োজন হয়।

খ. মাইক্রোস্ক্রিনিং (Micro-Screening)

মাইক্রোস্ক্রিনিং হলো বাজার চাহিদা, কারিগরি, বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার বিস্তারিত প্রক্রিয়া। নিচে মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করা হলো।

- **বাজার চাহিদা** : বাজার জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে পণ্যের চাহিদা, ক্রেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আগ্রহ, বাজারে প্রতিযোগীদের সংখ্যা এবং পণ্য বা সেবার সুযোগ-সুবিধা যথার্থভাবে যাচাই করা হয়।
- **কারিগরি দিক** : প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই করা হয় প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি নির্বাচন, প্রকল্প বাস্তবায়নের সহজসাধ্যতা ইত্যাদি।
- **বাণিজ্যিক দিক** : প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের বাণিজ্যিক লাভজনকতা নির্ধারণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের উপাদান, বিক্রয় মূল্য, আনুমানিক লাভ ইত্যাদি বিষয় খুব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হয়।
- **আর্থিক দিক** : এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় নিরূপণ, অর্থায়নের উপায়, মূলধন বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য লাভ ইত্যাদি হিসেব করে প্রকল্প বাছাই করতে হয়।
- **জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানঃ** জাতীয় অর্থনীতিতে প্রকল্পটি কীভাবে অবদান রাখবে তাও পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। অর্থনীতিতে অবদান যাচাই করার মাপকাঠি হলো কর্মসংস্থানের সুযোগ, জাতীয় কোষাগারে কর প্রদানের পরিমাণ ইত্যাদি।

আলোচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রকল্পটি সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও লাভজনক তাই বিনিয়োগের জন্য নির্ধারণ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্ষুদ্র সেবামূলক ব্যবসায়, কেনা-বেচা ও অন্যান্য খুচরা ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান বিবেচনা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসায়, যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদনমুখী ব্যবসায়ের প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে ম্যাক্রো ও মাইক্রো উভয় প্রকার স্ক্রিনিং আবশ্যক।

৩. ব্যবসায় প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন

ব্যবসায় প্রকল্প প্রণয়নের শেষ ধাপ হলো একটি সুন্দর প্রতিবেদন তৈরি করা। নির্বাচিত প্রকল্পটির সম্ভাবনা যাচাইয়ের তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করেই প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়।

ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিকল্পনার গাইডলাইন (Guideline for Small Business Plan)

একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। শিল্পোদ্যোক্তা নিজে অথবা অন্য কোনো বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারে। একটি সুষম ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্নে বর্ণিত গাইডলাইনগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।

- ব্যবসায় পরিকল্পনা যতটুকু সম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং শব্দ-বাহুল্য বর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- পণ্য ও বাজারের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের লক্ষ্য দু-একটি পণ্য বা অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত।
- ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা দলে অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়।

- কোনো পণ্যকে এমন টেকনিক্যাল শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা উচিত নয় যা কেবল বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন কিন্তু অন্যদের পক্ষে বোঝা কঠিন হয়।
- বাস্তবসম্মত উৎপাদনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে বিক্রয়ের পরিমাণ হিসাব করতে হবে। অত্যন্ত সাবধানতার সাথে বিক্রয় হিসাব রাখা উচিত।
- অস্পষ্ট তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত নয়।
- ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা বর্তমান ও ভবিষ্যতে উদ্ভব হতে পারে, এমন সমস্যার আলোচনা ব্যবসায় পরিকল্পনায় থাকা আবশ্যক।
- ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ব্যবস্থাপনা টিমের সকল সদস্যকে জড়িত করা এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিকল্পনার বিষয়বস্তু (Contents of Small Business Plan)

ব্যবসায়ের আকার, প্রকৃতি, ধরন ভেদে ব্যবসায় পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ভিন্ন হতে পারে। তবে একটি ব্যবসায় পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গু থাকে।

১. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম।

২. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা।

৩. উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তাগণের নাম।

৪. উদ্যোক্তা বা পরিচালকবৃন্দের পরিচিতি।

৫. ব্যবসায়ের ধরন (একমালিকানা, অংশীদারি বা যৌথ মূলধনী ব্যবসায়)

৬. ব্যবসায় পরিচালনার ধরন (একক ব্যবস্থাপনা, অংশীদারি ব্যবস্থাপনা বা যৌথ ব্যবস্থাপনা)

৭. মূলধনের পরিমাণ

৮. বাজার জরিপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (বাজারের আকার, ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সম্ভাবনা, বাজার প্রবেশের কৌশল, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ)

৯. মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা (মুনাফা অর্জনের বর্তমান লক্ষ্য, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অর্জনের দিক-নির্দেশনা)

১০. প্রাক্কলিত আর্থিক বিবরণীর সংযুক্তি :

ক. মোট প্রকল্প ব্যয়

খ. প্রাক্কলিত আয়

গ. প্রাক্কলিত ব্যয়সমূহ

ঘ. প্রাক্কলিত আয়-ব্যয় বিবরণী

ঙ. প্রাক্কলিত উদ্বৃত্তপত্র

চ. প্রাক্কলিত নগদানপ্রবাহ বিবরণী

ছ. সম-আয় ব্যয় বিবরণী।

নিম্নে একমালিকানাভিত্তিক একটি মুদি দোকান প্রকল্পের অনুমিত প্রাক্কলিত আর্থিক বিবরণী ছক উপস্থাপন করা হলো–

১. প্রকল্পের ব্যয়ের পরিমাণ

স্থায়ী মূলধন	**টাকা**
(এ জাতীয় খরচ ব্যবসায় শুরুর সময়ে একবারই করতে হয়)	
দোকান ভাড়া অগ্রিম	২,০০,০০০
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	১,০০,০০০
আসবাবপত্র ও সাজসজ্জা	২,০০,০০০
অন্যান্য	৫০,০০০
মোট	**৫,৫০,০০০**

চলতি মূলধন

(ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা বছরেই করতে হয়)	
বিভিন্ন রকম পণ্য সামগ্রী ক্রয়	৩,০০,০০০
কর্মচারীর বেতন	৪৮,০০০
বিদ্যুৎ খরচ	[illegible]
দোকান ভাড়া	৩৬,০০০
অন্যান্য	৫৪,০০০
মোট	**৪,৫০,০০০**

প্রকল্পের মোট ব্যয়

স্থায়ী মূলধন	৫,৫০,০০০
চলতি মূলধন	৪,৫০,০০০
মোট	১০,০০,০০০

প্রকল্পের অর্থায়ন পদ্ধতি

নিজস্ব তহবিল	৬,০০,০০০
আত্মীয়-স্বজন থেকে ঋণ	২,০০,০০০
ব্যাংক থেকে ঋণ	২,০০,০০০
মোট প্রকল্প ব্যয়	১০,০০,০০০

প্রাক্কলিত আয়-ব্যয় বিবরণী (বাৎসরিক)

প্রাক্কলিত আয় (বিক্রয় থেকে লব্ধ)		**৫,০০,০০০**
প্রাক্কলিত ব্যয়		
কর্মচারীর বেতন	৪৮,০০০	
বিদ্যুৎ বিল	১২,০০০	
দোকান ভাড়া	৩৬,০০০	
মালিকের ব্যক্তিগত খরচ	১,২০,০০০	
অন্যান্য	৪,০০০	
মোট	২,২০,০০০	
প্রাক্কলিত লাভ (বাৎসরিক)		**২,৮০,০০০**

প্রাক্কলিত নগদানপ্রবাহ বিবরণী (Estimated Cashflow Analysis)

সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যবসায় উদ্যোক্তার নগদানপ্রবাহ বিবরণী প্রাক্কলন করা প্রয়োজন। এই বিবরণী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এ বিবরণীতে নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ নগদ আসছে এবং কী পরিমাণ ব্যয় হচ্ছে তা সংরক্ষণ করা হয়। নগদানপ্রবাহ বিবরণী তৈরি করার ফলে উদ্যোক্তা তার ব্যবসায়ের নগদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে।

সম আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ (Break Even Analysis)

সম আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ ব্যবসায়ের এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যখন আয়-ব্যয় সমান হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এটি ব্যবসায়ের এমন রকম পর্যায় যখন লাভও হয় না, ক্ষতিও হয় না। আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে, যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে মোট বিক্রয়মূল্য, মোট ব্যয়ের সমপরিমাণ হয় তাকে সম আয়-ব্যয় বলে। যে বিন্দুতে পণ্য বিক্রয় করলে আয়-ব্যয় সমান হয় তাকে সম আয়-ব্যয় বিন্দু (Break Even point) বলে। সম আয়-ব্যয় বিন্দু জানা থাকলে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের আশায় পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মুনাফা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।

আত্মবিশ্লেষণ পদ্ধতির ধারণা ও প্রক্রিয়া (Concept and Process of Self-Analysis)

যে কোনো ব্যক্তির ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে তার ব্যবসা করার সক্ষমতা আছে কিনা যাচাই করা প্রয়োজন। এর প্রধান কারণ হলো ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ বা অকৃতকার্য হওয়ার ঝুঁকি আছে। ফলে ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে সক্ষমতা যাচাই করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ব্যবসায় সক্ষমতা যাচাই একটি জটিল বিষয়।

নিম্নের কর্মপত্রটি সততার সাথে পূর্ণ করলে একজন নতুন উদ্যোক্তা অনুধাবন করতে পারবে তার মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার গুণাবলি আছে কিনা।

ক্রমিক	প্রশ্ন	হ্যাঁ (১)	না (০)
১	তুমি কী একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পার?		
২	তুমি কী যেকোনো বিষয়ে সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পার এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সে সিদ্ধান্তে স্থির থাকতে পার?		
৩	তুমি কি দায়িত্ব নিতে এবং নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী?		
৪	তুমি যাদের সাথে থাক তারা কি তোমাকে বিশ্বাস ও সম্মান করে?		
৫	তোমার কি পরিপূর্ণ শারীরিক সুস্থতা রয়েছে?		
৬	তুমি কি একনাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে পারদর্শী?		
৭	তুমি কি অন্যদের সাথে মিশতে ও কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কর?		
৮	তুমি কি কার্যকরভাবে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং তোমার লক্ষ্য পূরণে তাদেরকে প্রভাবিত করতে পার?		
৯	অন্যরা কি সহজেই তোমার চিন্তা চেতনা ও ধারণা বুঝতে পারে?		
১০	যে ধরনের ব্যবসা তুমি শুরু করতে চাও, সে ব্যবসা সম্পর্কে তোমার কি ব্যাপক ধারণা আছে?		
১১	ব্যবসার আনুষঙ্গিক ব্যাপার যেমন হিসাব রক্ষণ, আয়কর ইত্যাদি ব্যাপারে তোমার কি ধারণা রয়েছে?		

১২	বিপণন ও অর্থায়নে তোমার কি অভিজ্ঞতা এবং ধারণা রয়েছে?		
১৩	ব্যবসায় শুরু করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের যোগান কি তোমার রয়েছে?		
১৪	ব্যবসায় শুরু করতে যে মালামাল প্রয়োজন সে ব্যাপারে কি তোমার ধারণা রয়েছে?		
১৫	তুমি কি সব কিছুর উর্ধ্বে থেকে ব্যবসায় শুরু করতে চাও?		

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার পর প্রত্যেক হ্যাঁ বোধক উত্তরের জন্য ১ নম্বর এবং না বোধক উত্তরের জন্য ০ নম্বর দিবে। এরপর মোট কত নম্বর হলো তা বের করবে। তোমার মোট প্রাপ্ত নম্বর যদি হয়:

১২ বা তার বেশি তাহলে : উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

৭–১১ তাহলে : তোমার সম্ভাবনা এখনো পরিপূর্ণ নয় কিন্তু চেষ্টা করলে তুমি পারবে।

৭ এর নিচে, তাহলে : উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যাপারে তোমার ইচ্ছাশক্তি তেমন তীব্র নয়।

অনেক ব্যক্তি উদ্যোক্তা হতে চাইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের পর্যাপ্ত যোগ্যতা, দক্ষতা ও তীব্র বাসনা থাকে না, কিন্তু আশার কথা পরবর্তীতে এ অবস্থার পরিবর্তন হতেও পারে। তখন তুমিও একজন উদ্যোক্তা হতে পারবে।

উপরের আত্ম-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি বিবেচনা করে একজন নতুন উদ্যোক্তার জন্য আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাগুলো চিহ্নিত কর-

কর্মপত্র –১ : আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা
• • • • • •

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি ব্যবসায়ীকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে?

ক. মূলধন | খ. পরিকল্পনা
গ. ভোক্তার আয় | ঘ. পণ্যের চাহিদা

২। কীভাবে প্রকল্পের সূচনা হয়?

ক. পণ্যের চাহিদা থেকে | খ. উদ্যোক্তার আগ্রহ দ্বারা
গ. কারিগরি শিক্ষা দ্বারা | ঘ. নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব শামীম দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। সম্প্রতি দেশে ফিরে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজ এলাকায় আধুনিক সাজে সজ্জিত একটি ফাস্ট ফুডের দোকান দেন। এলাকাটি জনবহুল হলেও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর। ফলে তার প্রত্যাশিত মাত্রায় মুনাফা অর্জিত হয়নি।

৩। জনাব শামীম ব্যবসায় শুরুর পূর্বে কোন দিকটি বিবেচনা করেননি?

ক. বাজারের আকার | খ. পণ্যের চাহিদা
গ. শিক্ষার হার | ঘ. পণ্যের মান

৪। জনাব শামীমের ব্যবসায়ে প্রত্যাশিত সফলতা না আসার কারণ–

i. ভোক্তার আয় কম
ii. সঠিক পণ্য নির্বাচন না করা
iii. বাজারের আকার ছোট।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii | খ. i ও iii
গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বর্তমানে আমাদের দেশে নির্মাণ ও হাউজিং শিল্পের ব্যাপক চাহিদার কথা মাথায় রেখে বুয়েট থেকে সদ্য পাস করা জনাব আরিফ আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে তারা পুরো কর্মকাণ্ডের দীর্ঘমেয়াদি একটি ছক প্রণয়ন করেন। প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট মূলধন নিজেদের না থাকায় মূলধন সংগ্রহের বিকল্প উৎসও নির্ধারণ করেন।

ক. পণ্যের বাজার চাহিদা জানার উপায়কে কী বলে?
খ. ব্যবসায়ের যান্ত্রিক দিকটি বর্ণনা কর।
গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব আরিফদের প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ধরনের মূলধন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জনাব আরিফ ও তার বন্ধুরা প্রকল্প প্রণয়নে যথার্থ পথ অনুসরণ করেছেন–এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

২। জনাব শাহেদ আনন্দ কনফেকশনারির মালিক। নিচে তার দোকানের বছর শেষের আয়-ব্যয়ের তথ্য ছকে উপস্থাপন করা হলো–

ব্যয়	টাকা	আয়	টাকা
দোকান ভাড়ার এককালীন অগ্রিম	২,০০,০০০.০০	পণ্য বিক্রয়	৫,১৬,০০০.০০
আসবাবপত্র ও সাজসজ্জা	২,০০,০০০.০০		
দোকান ভাড়া	৬০,০০০.০০		
কর্মচারীর বেতন	৩৬,০০০.০০		
বিদ্যুৎ বিল	১২,০০০.০০		
অন্যান্য খরচ	৮,০০০.০০		

ক. শিল্পের কাঁচামাল কোন পরিবেশ থেকে আসে?

খ. চলতি মূলধন বলতে কী বুঝায়। বর্ণনা কর।

গ. জনাব শাহেদের ব্যবসায়ে প্রাক্কলিত লাভ বের কর।

ঘ. বর্তমানে জনাব শাহেদের ব্যবসায়ের অবস্থা কি সন্তোষজনক? তোমার মতামত দাও।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের শিল্প

Industries of Bangladesh

নাফিসের বড় চাচা ছাতক সিমেন্ট কারখানার একজন ইঞ্জিনিয়ার। স্কুলের ছুটিতে নাফিস তার পিতা-মাতা ও ভাইবোনের সাথে চাচার কাছে বেড়াতে গেল। চাচা তাকে এবং তার চাচাত ভাই-বোনদেরকে সিমেন্ট কীভাবে তৈরি হয় দেখাতে নিয়ে গেলেন। নাফিস দেখল সেখানে হাজার হাজার পাথরের সমাবেশ। তার চাচা জানাল প্রতিদিন ভারত সীমান্ত থেকে অগণিত পাথর এখানে আসছে। এ সকল পাথরই হচ্ছে সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এ পাথরকে সিমেন্টে রূপান্তরিত করা হয়। ছাতক সিমেন্ট খুব মানসম্পন্ন।

নাফিসের দেখা ছাতক সিমেন্ট কারখানা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকারের শিল্প, এর গুরুত্ব এবং এগুলোর সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব।

এ অধ্যায়টি শেষে আমরা

- কুটির শিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের কুটির শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারব।
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কুটির শিল্পের উন্নয়নের পথে বাধাগুলো শনাক্ত করতে পারব।
- কুটির শিল্প বিকাশের জন্য করণীয় চিহ্নিত করতে পারব।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দেশের এবং নিজেদের এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারব।
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সমস্যাগুলো শনাক্ত করতে পারব।
- বৃহৎ শিল্পের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কুটির শিল্প স্থাপনে অনুপ্রাণিত হব।

শিল্পের প্রকারভেদ (Classification of Industry)

সাধারণত ব্যাপক মূলধন সামগ্রী ব্যবহার করে কারখানাতে কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে শিল্প বলা হয়। শিল্পের উৎপাদন সাধারণত কারখানাভিত্তিক হয় এবং নির্দিষ্ট দ্রব্যের কারখানাসমূহকে একত্রে শিল্প বলা হয়। যেমন- পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান হলেও দেশের অর্থনীতিতে শিল্পের ভূমিকা কম নয়। অর্থনীতিতে শিল্পের ভূমিকা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করে সেগুলোকে লাভজনকভাবে পরিচালনা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধিই প্রধান উদ্দেশ্য। জাতীয় শিল্পনীতি–২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পকে ব্যাপক অর্থে উৎপাদন শিল্প ও সেবামূলক শিল্প এ দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. উৎপাদনমুখী শিল্প (Manufacturing Industry)

পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুণঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক সকল প্রকার শিল্প উৎপাদনমুখী শিল্পের অন্তর্গত। উৎপাদন শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামালে প্রক্রিয়াজাত করে পরিণত পণ্যে রূপান্তর করা হয়। বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, চামড়া শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং রেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উৎপাদনমুখী শিল্পের উদাহরণ।

উদীয়মান জাহাজ নির্মাণ শিল্প

খ. সেবা শিল্প (Service industry)

যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধা সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান সেবামূলক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত । মৎস্য আহরণ, নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং, অটো মোবাইল সার্ভিসিং, বিনোদন শিল্প, হর্টিকালচার, ফ্লোরিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ, দুগ্ধ ও পোল্ট্রি উৎপাদন এবং বিপণন, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, পর্যটন ও সেবা, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি সেবা শিল্পের উদাহরণ।

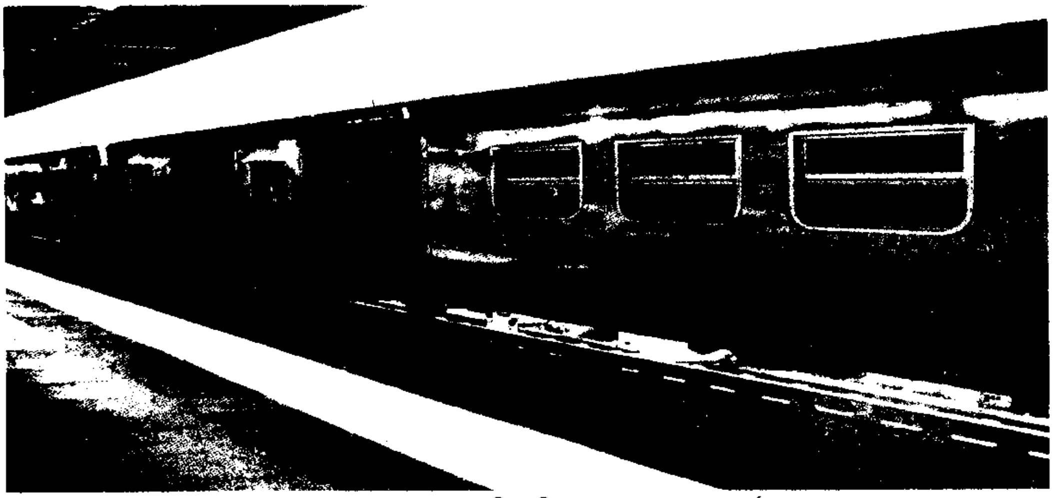

বাংলাদেশ রেলওয়ে : সরকারি পরিবহন খাতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম

বিনিয়োগের মাপকাঠিতে উৎপাদনমুখী শিল্প ও সেবা শিল্পকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, মাঝারি শিল্প, বৃহৎ শিল্প। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

কুটির শিল্প (Cottage Industry)

কুটির শিল্প বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য বিশিষ্ট সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জনবল ১০-এর অধিক নয়। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সহায়তায় কুটির শিল্প পরিচালিত হয়। তারা পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন সময়ে উৎপাদন বা সেবা কাজে জড়িত থাকে।

কুটির শিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী

বাংলাদেশের কুটির শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র

ছোট জায়গা, স্বল্প মূলধন, ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতা, কারিগরি জ্ঞান এবং পারিবারিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে কুটির শিল্প। নানা রকমের কুটির শিল্প আমাদের দেশকে করেছে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন অঞ্চলের কুটির শিল্প

এত বেশি সুনাম অর্জন করেছে, যার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সে অঞ্চলের কুটির শিল্পের নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন- রাঙ্গামাটি কুটির শিল্প, মনিপুরি কুটির শিল্প, কুমিল্লার খদ্দর ইত্যাদি। নিম্নে বাংলাদেশের কুটির শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্রের একটি তালিকা দেয়া হলো–

কুটির শিল্পের ধরন	উৎপাদিত দ্রব্যাদি
পাটজাত শিল্প	স্কুল ব্যাগ, শিকা, দেয়াল মাদুর, পাটের স্যান্ডেল, কার্পেট
বাঁশ ও বেত শিল্প	বেতের ঝুড়ি, বাল্ব শেড, চায়ের ট্রে, বেতের চেয়ার, দোলনা, পুতুল, ঝুড়ি, ফুলদানি, চাটাই, ডালা, কুলা, চালুন
মৃৎ শিল্প	বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু, ফল, ফুল, তৈজসপত্র, শোপিস, পুতুল, ফুলদানি, ফুলের টপ, হাঁড়ি, কলসি ও অন্যান্য সামগ্রী
তাঁত ও বস্ত্র শিল্প	শাড়ি, লুঙ্গি, টেবিল ক্লথ, সোফার ক্লথ, জামদানি, সোয়েটার, ব্যাগ, মাফলার, সুতার টুপি, ওয়ালম্যাট, চাদর, গামছা, শীত বস্ত্র, রেডিমেড গার্মেন্ট, হোসিয়ারী ।
খাদ্য ও সহায়ক শিল্প	চানাচুর, জ্যামজেলি, মধু, গুড়, রসগোল্লা, মিষ্টি, দধি, চিপস, সেমাই, কনফেকশনারি
হস্ত শিল্প	হাতের শিল্প কার্পেট, সতরঞ্চি, নকশিকাঁথা, অফিস স্টেশনারি, ও বুক বাইডিং, মাছ ধরার জাল, মাদুর, মিষ্টির প্যাকেট
ঝিনুক শিল্প	ঝিনুকের মালা, অলংকার, খেলনা, শোপিস,
ক্ষুদ্র ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প	দা, কোদাল, খুন্তি, কাঁচি, সুরমাদানি, রেডিও-টেলিভিশন ও ফ্রিজ মেরামত, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ, বালতি-ট্রাঙ্ক তৈরি, মটর সাইকেল, জিপ, ট্রাক ও বাস মেরামত।
কেমিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প	ব্যবহারিক তৈল, আতর, গোলাপজল, আগরবাতি, মোমবাতি, ওয়াশিং সোপ, ফিনাইল

কর্মপত্র–১ : তোমাদের এলাকায় যে সকল কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর
•
•
•
•
•
•

ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industry)

উৎপাদনমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য, প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫–৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে।

ক্ষুদ্র শিল্পের ছবি

সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০–২৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

মাঝারি শিল্প (Medium Industry)

উৎপাদনমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য, প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ কোটি টাকার অধিক এবং ৩০ কোটি টাকার মধ্যে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০–২৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য, প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০–১০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

একটি মাঝারি আকারের গার্মেন্টস শিল্প

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ধরন	উৎপাদিত শিল্প
খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প	ময়দা, আটা, সুজি, সেমাই, ব্রেড ও বিস্কুট, লাল চিনি, মধু শোধন, শুকনা ও টিনজাত মাছ, তেলের মিল, চকোলেট, সিগারেট ও বিড়ি কারখানা, চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ (স্বয়ংক্রিয় চাল কলসহ)
বস্ত্র শিল্প	থান কাপড়, বেডশিট, শার্ট-প্যান্টের কাপড়, শাড়ি, গামছা।
পাট ও পাটজাত শিল্প	সুতা, সুতলি, পাটের ব্যাগ, কাপড়, কার্পেট, পাটের স্যান্ডেল ও সকল পাটজাত দ্রব্য
বন শিল্প	কাঁঠ, বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিসপত্র, করাত কল, কাঠের খেলনা ও উন্নতমানের আসবাবপত্র, ক্রীড়া সামগ্রী,
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প	বিভিন্ন ধরনের কাগজ, প্যাকেট, কার্টন তৈরি
চামড়া ও রাবার শিল্প	চামড়া ও রাবারের ব্যাগ, জুতা কারখানা
ক্ষুদ্র ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প	হাস্তচালিত টিউবওয়েল, কৃষি যন্ত্রপাতি, মিল কারখানার যন্ত্রপাতি, অটো মোবাইল সামগ্রী।
কেমিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প	বিভিন্ন ধরনের রং, পেইন্ট, প্লাস্টিক কারখানা, ঔষধ তৈরির কারখানা, জৈব সার, মিশ্র সার, গুঁটি ইউরিয়া তৈরি
গ্লাস ও সিরামিক শিল্প	বিভিন্ন ধরনের গ্লাস ও সিরামিক সামগ্রী, চীনা মাটির জিনিসপত্র
হিমাগার শিল্প	বিভিন্ন ধরনের হিমাগার

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দারিদ্র্য বিমোচন স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এর অবদান উল্লেখযোগ্য। দেশের ৯৬ ভাগ শিল্পই কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আওতাভুক্ত। কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র হচ্ছে এ সকল শিল্প। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এ শিল্পের সাথে জড়িত। স্বল্প মূলধন, স্থানীয় কাঁচামাল, ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, সৃজনশীলতা, পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে মহিলাদের কর্মশক্তি ব্যবহার করে এ জাতীয় শিল্পগুলো গড়ে উঠে। ফলে লাখো মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে দেশের গ্রামীণ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য লালন ও বিকাশে এবং সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে দিতেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিসংখ্যান : জুন ২০১১

মোট ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা	৯৩,৬৬০
মোট কুটির শিল্পের সংখ্যা	৬,৩৬,৫৭৭
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান	৩৩.৩৭ লক্ষ

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে করণীয়

কুটির শিল্প প্রধানত পরিবারভিত্তিক। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পরিবারের সদস্যগণ ছাড়াও বাইরের শ্রমশক্তির প্রয়োজন হয়। এ জাতীয় শিল্পের উদ্যোক্তাগণ নিজের শ্রম ও মেধা খাটিয়ে এবং স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তবে এ শিল্পের বিকাশে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। সেগুলো হলো–

১. **কাঁচামালের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ** : সাধারণত যে জাতীয় কাঁচামাল যেখানে বেশি সেখানেই এ জাতীয় শিল্পগুলো বেশি গড়ে উঠে। তবে অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যোগাযোগ অব্যবস্থাসহ অন্যান্য কারণে কাঁচামাল পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়লে শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এ জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

২. **বাজারের নৈকট্য** : উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও বিপণনের জন্য প্রয়োজন বাজারের। আবার কাঁচামাল ক্রয়ের বাজারও কাছাকাছি থাকা উচিত। কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার নিশ্চিত করা গেলে এ জাতীয় শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

৩. **শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান** : ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প মূলত শ্রমঘন শিল্প। এদের বিকাশে দক্ষ জনশক্তি ও স্বল্প মজুরিতে শ্রমিকের প্রাপ্যতা গুরুত্বপূর্ণ। কুটির শিল্পের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ডিজাইন ও দক্ষ কারিগরি জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষ করার সুযোগ থাকতে হবে।

৪. **পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা** : প্রাথমিক অবস্থায় স্থানীয় কাঁচামাল ও বাজারের উপর নির্ভর করে শিল্প প্রতিষ্ঠা হলেও পণ্যের বাজার বিস্তৃত হলে তার বিক্রয় ও বিপণনের জন্য এবং কাঁচামাল যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে আনা-নেয়ার জন্য যোগাযোগের সুব্যবস্থা আবশ্যক।

৫. **স্থানীয় ও বৈদেশিক চাহিদার উপর গুরুত্বারোপ** : যেহেতু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে, তাই স্থানীয় চাহিদা পূরণের গুরুত্ব দিয়ে শিল্প স্থাপিত হয়। তবে শুধুমাত্র স্থানীয় চাহিদার দিকে লক্ষ রাখলেই হয় না। বৈদেশিক বাজারের প্রসার ও একই সঙ্গে চাহিদা পূরণের দিকেও গুরুত্ব দিতে হয়।

৬. **পুঁজির সহজলভ্যতা** : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন হলেও সকল সময় উদ্যোক্তার পক্ষে পুঁজির যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই ব্যাংকসহ বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ ঋণ হিসেবে পাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।

৭. **সরকারি সুযোগ-সুবিধার সহজলভ্যতা** : কুটির শিল্প দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতীক। তাই এ বিকাশ ও প্রকাশের জন্য সরকারি সকল ধরনের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। আশার কথা যে, সরকার 'ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। সরকার ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তাদান, তাঁতশিল্প রক্ষা, বেনারসি ও জামদানি পল্লীর মতো রেশম পল্লী গড়ে তোলাসহ তাঁতি, কামার, কুমার, মৃৎশিল্প, বাঁশ, বেত, তামা, কাঁসা ও পাটি শিল্পে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বৃহৎ শিল্প (Large Industry)

উৎপাদনমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের

অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, কাগজ শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প, গার্মেন্ট শিল্প, ইস্পাত শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, ঔষধ তৈরি শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প ও চা শিল্প।

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় বৃহৎ শিল্প

- খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প
- জনশক্তি রপ্তানি
- জাহাজ নির্মাণ ও পরিবেশসম্মত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প
- নবায়ন যোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল)
- পর্যটন শিল্প
- আইসিটি পণ্য ও আইসিটি ভিত্তিক সেবা
- তৈরি পোশাক শিল্প
- ভেষজ ঔষধ শিল্প
- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
- হাসপাতাল ও ক্লিনিক
- অটোমোবাইল

ঢাকা ইপিজেড, সাভার

মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপিতে) শিল্পখাতের অবদান (শতকরা হার %)

ধরন	আর্থিক বছর ২০০৫-০৬	আর্থিক বছর ২০০৬-০৭	আর্থিক বছর ২০০৭-০৮	আর্থিক বছর ২০০৮-০৯	আর্থিক বছর ২০০৯-১০	আর্থিক বছর ২০১০-১১
শিল্প*	২৯.০৩	২৯.৪৫	২৯.৭	২৯.৮৬	২৯.৯৩	৩০.৩৩
মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প	১২.১৪	১২.৪৭	১২.৬৩	১২.৭১	১২.৬৮	১৩.১২
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৪.৯৪	৫.০৮	৫.১৪	৫.১৮	৫.২৬	৫.২৯
মোট শিল্প (উৎপাদনমুখী)	১৭.০৮	১৭.৫৫	১৭.৭৭	১৭.৯	১৭.৯৪	১৮.৪১
	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

(*শিল্প বলতে খনিজ, উৎপাদনমুখী, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি ও নির্মাণ শিল্পকে বোঝায়)

উন্নত ও অনুন্নত শিল্প এলাকা

বাংলাদেশ শিল্পে অনগ্রসর। কতিপয় সমস্যা ও বাধার কারণে শিল্পোন্নয়নের গতি এখনও মন্থর। প্রধানত অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো যেমন- অনুন্নত রাস্তা-ঘাট, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব, মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব ও শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি কারণে শিল্পোন্নয়নের গতিধারা ব্যাহত হচ্ছে। আবার দেশের সকল এলাকা শিল্পে সমানভাবে উন্নত নয়। ফলে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের

বিভিন্ন জেলাতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ২০১০ সালের শিল্পনীতিতে বাংলাদেশের শিল্পে অগ্রসর ও অনগ্রসর জেলাসমূহের একটি তালিকা প্রদান করেছে। উক্ত তালিকা নিম্নরূপ :

বিভাগ	উন্নত জেলা	অনুন্নত জেলা
ঢাকা বিভাগ	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুর।	জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ।
চট্টগ্রাম বিভাগ	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর	খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান
রাজশাহী বিভাগ	বগুড়া।	জয়পুরহাট,নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা।
রংপুর বিভাগ		রংপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা।
খুলনা বিভাগ		চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট।
বরিশাল বিভাগ		বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা।
সিলেট বিভাগ		সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ

কর্মপত্র–২ : তোমাদের নিজ জেলা নির্বাচন কর এবং সে জেলা শিল্পের জন্য উন্নত বা অনুন্নত হবার কারণগুলো চিহ্নিত কর

নিজ জেলার নাম	শিল্প এলাকা হিসেবে অবস্থান	শিল্পে উন্নত হবার বা অনুন্নত থাকার কারণ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সর্বশেষ জাতীয় 'শিল্পনীতি' ঘোষিত হয় কত সালে?

ক. ২০০৯ খ. ২০১০

গ. ২০১১ ঘ. ২০১২

২। ক্ষুদ্রশিল্প বলতে নিম্নের কোনটিকে বোঝায়?

ক. যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত

খ. ১০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান

গ. স্থায়ী সম্পত্তি প্রতিস্থাপন বাবদ ব্যয় ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা

ঘ. পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব সাদিফ তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শো-পিস তৈরি করে তার দোকানে বিক্রি করেন এবং বেশ লাভবান হন। জনাব সাদিফের প্রতিবেশীরাও উৎসাহিত হয়ে এ ধরনের শিল্প গড়ে তুলেছেন।

৩। জনাব সাদিফের শিল্পটি কোন ধরনের?

ক. ক্ষুদ্র শিল্প খ. কুটির শিল্প

গ. মাঝারি শিল্প ঘ. বৃহৎ শিল্প

৪। জনাব সাদিফ তার কাজের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে–

i. কর্মসংস্থান তৈরিতে

ii. জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে

iii. দেশীয় ঐতিহ্য রক্ষায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাশিক ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে পাটচাষের জন্য বিখ্যাত ঢাকা বিভাগের ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর গ্রামে একটি পাট ও পাটজাতশিল্প স্থাপন করেন। তার বন্ধু রাফি সমপরিমাণ বিনিয়োগ করে একই ধরনের শিল্প স্থাপন করলেন রাজশাহী অঞ্চলে যেখানে আখ চাষ বেশি হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে রাশিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানটি রাফির প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি মুনাফা করে।

ক. ব্যাপক অর্থে শিল্পকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

খ. সেবা শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. বিনিয়োগের মাপকাঠিতে রাশিকের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? বর্ণনা কর।
ঘ. রাশিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানটিতে অধিক মুনাফা হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২। কক্সবাজারের জেরিন তাসনিম বিদ্যুৎতের ক্রমাগত চাহিদার কথা বিবেচনা করে সরকারি অনুমতি নিয়ে সমুদ্রতীরে একটি বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করলেন। সমুদ্রের বাতাসকে কাজে লাগিয়ে উইন্ড মিলের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করেন। তার এ শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৩ কোটি টাকার অধিক।
ক. বিনিয়োগের মাপকাঠিতে শিল্পকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
খ. কুটির শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. জনাব জেরিনের শিল্পটি কোন ধরনের? বর্ণনা কর।
ঘ. জনাব জেরিন তাসনিমের স্থাপিত শিল্পের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল হবে-মূল্যায়ন কর।

অষ্টম অধ্যায়

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা

Management of Business Organization

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে ব্যবস্থাপনার উৎপত্তির সহ-সম্পর্ক রয়েছে। শুরুতে ব্যবস্থাপনা ছিল পরিবার ও দলভিত্তিক। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবস্থাপনার ধারণাটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে ব্যবসায়ী সমাজের ব্যবসা পরিচালনা পদ্ধতি থেকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যদের দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশলকে ব্যবস্থাপনা বলে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ধারণা, কার্যাবলি, এবং ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানতে পারব।

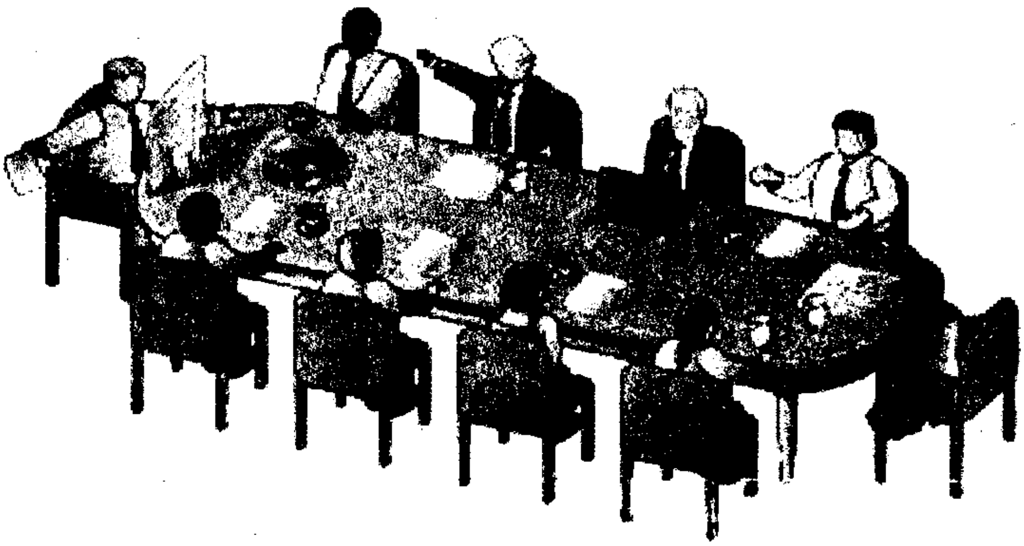

এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে আমরা–

- ব্যবস্থাপনার ধারণা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিকল্পনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- সংগঠিতকরণের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- ভালো নেতার গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারব।
- ব্যবসায় অর্থায়নের ধারণা ও উৎসগুলো বর্ণনা করতে পারব।

ব্যবস্থাপনার ধারণা (Concept of Management)

জনাব রহমান গত ৫ বছর যাবত কাপড়ের ব্যবসায় পরিচালনা করে আসছেন। তার দোকানে সব প্রকারের কাপড় ও তৈরি পোশাক পাওয়া যায়। প্রতিদিন অনেক ক্রেতা সেখানে ভিড় করেন। তিনি নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি পাবার কারণে তিনি কর্মচারী নিয়োগের চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। সম্প্রতি তিনি একজন কর্মচারী নিয়োগ করলেন। ফলে তার কাজের চাপ কিছুটা কমল। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর ক্রেতারা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেরিতে দোকান খোলা ও দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ আনেন। রহমান সাহেব ক্রেতাদের অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনে তার কর্মচারীকে ডেকে ব্যবসায়ের সুনাম রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। কর্মচারীটি তার ভুল বুঝতে পারল। সে ভবিষ্যতে আরো মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হলো।

উপরের গল্পে ব্যবসায়ী রহমান সাহেবের কর্মচারী নিয়োগের চিন্তা, কর্মচারী নিয়োগ, কর্মচারীর বিরুদ্ধে ক্রেতাদের অভিযোগ শোনা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া সবকিছুই তার ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার অংশ।

ব্যবস্থাপনা হচ্ছে অন্য লোকদের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়ার দক্ষতা ও কৌশল। আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলে পরিচিত হেনরি ফেওয়েল (Henri Fayol)-এর মতে 'ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠিতকরণ, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি।' ব্যবস্থাপনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

- **ব্যবস্থাপনা হলো কতকগুলো কাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।**
- **ব্যবস্থাপনা পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত হয়।**
- **ব্যবস্থাপনা একটি দলগত প্রক্রিয়া।**
- **ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময়ের পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে ব্যবস্থাপনার কাজের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হয়।**

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি (Functions of Management)

পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত কার্যাবলিকে ব্যবস্থাপনা বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার মানবিক ও অন্যান্য উপাদানকে দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার আওতায় অনেকগুলো কাজ করতে হয়। নিম্নে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হলো–

১. **পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning)** : পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দিক-নির্দেশনা। কোনো ব্যবসায় সংগঠনের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কী কাজ, কে, কীভাবে, কখন করবে তা নির্ধারণ করাই হলো পরিকল্পনা। ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২. **সংগঠিতকরণ (Organizing)** : ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় সকল মানবিক ও বস্তুগত উপকরণ এবং সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন এবং আন্তঃসম্পর্ক তৈরির কার্যাবলিকে সংগঠিতকরণ বলা হয়।

৩. **কর্মীসংস্থান (Staffing)** : প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উপাদান হচ্ছে তার কর্মী বাহিনী। কর্মী বাহিনীকে ব্যবসায়ের অন্যতম মানবিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, পদোন্নতি, বদলি, ছাঁটাই প্রভৃতি কাজ কর্মীসংস্থানের অন্তর্ভুক্ত।

৪. **নির্দেশনাদান (Directing)** : পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কর্মীদের আদেশ-নির্দেশ প্রদান করাকে নির্দেশনা বলে। ব্যবস্থাপক কর্মীদের কোন কাজ কখন, কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। যথার্থ নির্দেশনা দিতে পারলে কর্মীরা সর্বাধিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। অনেকে নির্দেশনাদানকে নেতৃত্বদানের সাথে তুলনা করেছেন।

৫. **প্রেষণাদান (Motivating)** : প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে কাজের প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী করার প্রক্রিয়াকে প্রেষণা বলা হয়। প্রেষণার ফলে কর্মীরা আগ্রহ নিয়ে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয় এবং মানসম্মত কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়।

৬. **সমন্বয়সাধন (Co-ordinating)** : সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়ায় ব্যবসায় সংগঠনের কর্মী, বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকলে মিলে একটি দলে পরিণত হয় যা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে।

৭. **নিয়ন্ত্রণ (Controlling)** : পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করা, ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় করা এবং প্রয়োজনে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সার্বিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হয়।

পরিকল্পনার ধারণা (Concept of Planning)

ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষক কোহিনূর আক্তার তার ক্লাসে প্রবেশ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। শিক্ষার্থীরাও আনন্দের সাথে তাকে স্বাগত জানাল। শিল্পের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনার শুরুতে তিনি শিক্ষার্থীদের নিকট শিল্প কারখানার পরিদর্শন করার অভিজ্ঞতা জানতে চান। দেখা যায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর শিল্প কারখানা সরাসরি দেখার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তিনি সবাইকে নিয়ে জেলার বিসিক শিল্প নগরী পরিদর্শন করার আগ্রহ প্রকাশ করলে সকল শিক্ষার্থী আনন্দে ফেটে পড়ে। তিনি সবাইকে শান্ত করেন এবং বলেন এর জন্য প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া আরো যা চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে–তা'হলো-

কখন যাওয়া হবে?

কীভাবে যাওয়া হবে?

কতজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক যাবেন?

যেখানে যাবে তাদের কর্তৃপক্ষের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা হবে?

সবশেষে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্ন রাখলেন : কারখানা পরিদর্শনের জন্য আমাদের এসকল পূর্ব-ধারণা বা চিন্তা-ভাবনাকে আমরা কী বলতে পারি। শিক্ষার্থীরা সমস্বরে জবার দিল : পরিকল্পনা। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি আরো বললেন, কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা বা আগাম সিদ্ধান্তই হলো পরিকল্পনা। আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে, কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কী কাজ করতে হবে, কখন করতে হবে, কোথায় করতে হবে, কত সময়ে কাজ শেষ হবে, এ সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে পরিকল্পনা বলে। সঠিক পরিকল্পনা উদ্দেশ্য অর্জনকে সহজ করে। পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকল উপকরণ ও সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব সঠিকভাবে বণ্টন করা যায়। ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

কর্মপত্র–১ : একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনার প্রয়োজন কেন?
•
•
•
•
•
•

সংগঠিতকরণের ধারণা ও গুরুত্ব (Concept and Importance of Organizing)

'আশার বাণী' স্টোরের মালিক প্রশান্ত দাস তার নিজ এলাকায় সুনামের সাথে ব্যবসায় করে আসছেন। তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে তৈরি পোশাক, কসমেটিকস, শিশুদের খাদ্য-দ্রব্য ও খেলনাসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তবে তার ব্যবসায়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় আইটেম হচ্ছে নিজের তত্ত্বাবধানে তৈরি বিভিন্ন প্রকারের আচার। প্রতি বছর তিনি স্থানীয় বাজার থেকে কাঁচা আম, আমড়া, পাকা বরুই, জলপাই ও আমলকি কিনে আচার তৈরি করে বিক্রি করেন। সে জন্য বিভিন্ন মৌসুমে অস্থায়ীভাবে কিছু মহিলাকে নিয়োগ দেন যারা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাকে আচার বানাতে ও বোতলজাত করতে সাহায্য করেন। দিনে দিনে তার আচারের খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি আচার তৈরি ও বিক্রির জন্য একটি আলাদা বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে জন্য আচার তৈরিকারী মহিলাগণকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিলেন। একজনকে পৃথক ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব দিলেন। বছরব্যাপী কাঁচামাল সংগ্রহ, আচার তৈরি ও তা সংরক্ষণ করার জন্য দায়িত্ব বণ্টন করে দিলেন।

প্রশান্ত দাসের সম্পাদিত সকল কাজ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার অংশ। এ সকল কাজকে সংগঠিতকরণ বলে।

কারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্যামল দাস তার ব্যবসায়ের মানবিক ও বস্তুগত সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং সম্পদ সংগ্রহ ও সমন্বিত করে সেগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করে দিয়েছেন। সংগঠিতকরণের ফলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়। প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সহজ হয়। নিজেদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার কারণে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়।

কর্মপত্র–২ : একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সংগঠিতকরণের গুরুত্ব
•
•
•
•
•

নেতৃত্বের ধারণা (Concept of Leadership)

আখিতারা ফার্নিচার্স-এর মালিক জনাব আরশাদ সামান্য পুঁজি নিয়ে তার ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম, সততা, কর্মচারীদের পরিচালনা করার দক্ষতা ও ব্যবসায়ের উন্নতির প্রতি প্রবল আগ্রহ তাকে আজ সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। আজ তার ব্যবসায়ের পাঁচটি শাখা সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি কর্মচারীদের সকল অভাব-অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সাধ্যমতো তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে কর্মচারীরাও ব্যবসায়টিকে নিজেদের মনে করে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে, গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করে ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

কাহিনীটিতে আমরা জনাব আরশাদের যে গুণগুলো পাই সেগুলো :

- তিনি পরিশ্রমী
- তিনি সৎ
- কর্মচারীদের পরিচালনা করতে তিনি দক্ষ
- ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তিনি আগ্রহী
- কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ শোনা ও দূর করতে আন্তরিক।

উপরোক্ত সবগুলো গুণের সমষ্টিকে আমরা জনাব আরশাদের নেতৃত্বের গুণাবলি বলতে পারি। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বলতে উদ্দেশ্য অর্জনকে সামনে রেখে কাজ সম্পাদনে কর্মীদের উৎসাহিত করার গুণ ও কৌশলকে বোঝায়।

নেতৃত্বের প্রকারভেদ (Classification of Leadership)

ক্রমিক	নেতৃত্বের ধরন	বৈশিষ্ট্য
১.	গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Democratic Leadership)	• নেতা অধস্তনদের সাথে আলোচনা করেন। • অধস্তনদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। • কর্মীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। • কর্মীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। • কর্মীরা প্রশ্ন করলে তার জবাব দেন। • কর্মীদের জবাবদিহিতা আশা করেন। • কর্মীদের নিকট জবাবদিহি করেন। • কর্মীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের অংশ মনে করেন।
২.	স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Autocratic Leadership)	• নেতা শুধু আদেশ করেন, জবাবদিহি করেন না। • সম্পূর্ণভাবে নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেন। • কর্মীদের সামর্থ্যের উপর আস্থা রাখেন না। • কর্মীদের মতামত বা পরামর্শ গ্রহণ করেন না। • কর্মীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। • কর্মীদের সবসময় চাপের মুখে রাখেন। • কর্মীরা প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের ভাবতে পারেন না।

৩.	মুক্ত নেতৃত্ব (Laissez Faire Leadership)	• নেতা-কর্মীদের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। • নিজে কাজ করতে পছন্দ করেন না এবং আগ্রহী নন। • কর্মীদের উপর সুনির্দিষ্ট আদেশ দেন না। • কর্মীদের জবাবদিহিতা আদায় করেন না। • কর্মীরা নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করে থাকে। • সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় বেশি লাগে। • প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে ভালো আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ও দলীয় কাজের উপর।
৪.	আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Bureaucratic Leadership)	• নেতা-কর্মীদের আদেশ দিয়ে কাজ আদায় করে নেন। • কর্মীরা নেতার চেয়ে আদর্শকে বড় করে দেখেন এবং পালন করতে বাধ্য থাকেন। • সর্বদা নিয়মমাফিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। • নেতার চেয়ে নেতার আদেশ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে শৃঙ্খলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মপত্র-৩ : বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করে নিচের কর্মপত্রটি সম্পাদন করতে হবে।

নেতৃত্বের ধরন	সুবিধা	অসুবিধা
গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব	• • • •	• • • •
স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব	• • • •	• • • •
মুক্ত নেতৃত্ব	• • • •	• • • •
আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব	• • • •	• • • •

আদর্শ নেতার গুণাবলি (Qualities of Ideal Leaders)

যিনি নেতৃত্ব দেন তাকে নেতা বলা হয়। নেতার কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উৎসাহিত ও পরিচালনা করা। নেতৃত্বদানের কঠিন দায়িত্বশীল কাজটি সম্পাদনের জন্য একজন নেতার অনেকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। কেননা উপযুক্ত নেতৃত্ব যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে, তেমনি নেতার অযোগ্যতা প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। নিম্নে একজন আদর্শ নেতার গুণগুলো বিশ্লেষণ করা হলো।

১. **দৈহিক সামর্থ্য ও সুস্থতা** : নেতাকে অনেক দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম ও চাপ বহন করতে হয়। এ জন্য তার দৈহিক সামর্থ্য থাকার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা থাকা আবশ্যক। তাছাড়া তার দৈহিক গঠনও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত।

২. **প্রখর ব্যক্তিত্ব** : নেতাকে ব্যক্তিগতভাবে ধীর-স্থির হতে হয়। মার্জিত ব্যবহার, সম্মোহনী ক্ষমতা মিশ্রিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী নেতাকে অধস্তনরা সম্মান করে।

৩. **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা** : আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষকে অনেক ইতিবাচক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সাহায্য করে। সাথে সাথে অভিজ্ঞতাও তাকে সমৃদ্ধ করে। তাই একজন নেতার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকা কাম্য।

৪. **সাহস ও সততা** : নেতাকে সবসময় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হয়। তাকে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং কাজে হাত দিতে হয়। তাই তাকে হতে হয় সাহসী। সাথে সাথে তাকে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে হয়। কারণ সততা ও সাহসের জন্য সে অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করে।

৫. **পরিশ্রম ও সহনশীলতা** : পরিশ্রম যে কোন কাজের মূল। নেতাকেও তার দায়িত্বের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। নেতা যদি অলস হন, কাজ না করেন, অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যান তাহলে অধঃস্তনদের সঠিকভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া সহনশীলতা না থাকলে তার পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হবে না।

৬. **দায়িত্বশীলতা ও সহযোগিতা** : দায়িত্বের প্রতি নেতার একাগ্রতা অনুসারীদের জন্য অনুপ্রেরণার কারণ হয়। অন্যদিকে সকলের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করে তোলে।

৭. **সাংগঠনিক দক্ষতা** : একজন নেতার প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়ে দক্ষতা থাকা উচিত, যাতে কোন দায়িত্বের জন্য কে উপযুক্ত তা বাছাই করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করে দিতে পারেন।

৮. **মানবিক সম্পর্ক অনুধাবনঃ** একজন সফল নেতার অবশ্যই তার সাথের লোকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি, যোগ্যতা, রুচি, ব্যক্তিত্ব অনুধাবন করার যোগ্যতা থাকা উচিত। সহকর্মীদের মনোভাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দিতে না পারলে কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল আশা করা যায় না।

৯. **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা** : যথাসময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য নির্ভর করে। নেতাকে তার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নেতার গৃহীত সিদ্ধান্ত অধঃস্তনদের আস্থা ও মনোবল বাড়িয়ে দেয়।

১০. **জেন্ডার সচেতনতা** : একজন নেতা তিনি নারী বা পুরুষ যেই হোন না কেন তাকে অবশ্যই তার সহকর্মী নারী-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাকে অবশ্যই পক্ষপাতহীন হতে হবে। নারী-পুরুষের ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকে তাকে নেতৃত্ব দিতে হয়।

কর্মপত্র–৪ : আত্মবিশ্লেষণ করে তোমার মধ্যে একজন নেতার কোন গুণগুলো আছে এবং কোনগুলোর উন্নতি করা প্রয়োজন তা বের কর

আদর্শ নেতার গুণাবলি	হ্যা	না
• দৈহিক সামর্থ্য ও সুস্থতা		
• প্রখর ব্যক্তিত্ব		
• শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা		
• সাহস ও সততা		
• পরিশ্রম ও সহনশীলতা		
• দায়িত্বশীলতা ও সহযোগিতা		
• সাংগঠনিক দক্ষতা		
• মানবিক সম্পর্ক অনুধাবন		
• সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা		
• জেন্ডার সচেতনতা		

ব্যবসায়ে অর্থায়নের ধারণা (Concept of Finance in Business)

রাঙ্গামাটির সমীর চাকমা চাকরির চেষ্টা করে একটা বছর নষ্ট করল। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই আবার চাকরি ও ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত সে ব্যবসায় করবে বলে মনস্থির করল। উপজেলার সরকারি বিদ্যালয়ের পাশে তাদের নিজস্ব দোকান আছে। সেখানে একটি স্টেশনারি দোকান দিয়ে ব্যবসায় শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করল। তার সিদ্ধান্তে পিতা-মাতা খুশি হলো। কিন্তু কোথা থেকে মূলধন পাবে চিন্তা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ব্যবসায় শুরু করার জন্য পিতার নিকট থেকে এক লক্ষ টাকা ও পিসির নিকট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগাড় করল। প্রবাসী মামা এক লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলো। পিতা তাকে টাকা-পয়সা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিলেন। প্রয়োজনে স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকেও ঋণ নেওয়া যাবে বলে জানালেন। উপরের গল্পে সমীর চাকমার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা, অর্থ সংগ্রহের উৎস অনুসন্ধান, অর্থ সংগ্রহ ও অর্থ ব্যবহারের যাবতীয় কার্যাবলিকে আমরা অর্থায়ন বলতে পারি।

সাধারণ অর্থে, ব্যবসায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাকে অর্থায়ন বলে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে, ব্যবসায়ের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ, অর্থ সংরক্ষণ, সংগৃহীত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার সংক্রান্ত সকল কার্যাবলিকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলা হয়।

অর্থায়নের উৎস (Sources of Finance)

যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বা মূলধনের প্রয়োজন। এ অর্থ প্রয়োজন হয় ব্যবসায় শুরু করার জন্য, ব্যবসায় কার্যক্রম সচল রাখার জন্য এবং ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য। ব্যবসায়ের এ মূলধন বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো–

১. **নিজস্ব তহবিল** : ক্ষুদ্র ব্যবসায় যেমন একমালিকানা কিংবা অংশীদারি ব্যবসায়ের মালিক নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করে।

২. **আত্মীয়-স্বজন** : মালিকের নিজস্ব তহবিল অপর্যাপ্ত হলে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংক** : সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংকসহ সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে নগদ অর্থ ধার দিয়ে থাকে। সাধারণত ব্যবসায়ের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকই অর্থ সংগ্রহের প্রধান উৎস।

৪. **সমবায় ব্যাংক** : সমবায় ব্যাংক সদস্যদেরকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। সদস্যদের বাইরেও এ ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে।

৫. **গ্রামীণ ব্যাংক** : গ্রামীণ ব্যাংক ছোট আকারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়।

৬. **কৃষি ব্যাংক** : বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবরাহ করে থাকে।

৭. **বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ** : দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য এ ব্যাংক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে।

৮. **ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স লিঃ** : **ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস হলো ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ** এন্ড কমার্স বা বেসিক ব্যাংক ।

৯. **বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা** : অনেক বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও রয়েছে যারা সুদের বিনিময়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ দিয়ে থাকে।

কর্মপত্র–৫ : তোমার এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসার এর জন্য কোন কোন উৎস থেকে ঋণ পাবার সুযোগ আছে সেগুলোতে টিক এবং যেগুলোতে নেই সেখানে ক্রস চিহ্ন দাও

অর্থায়নের উৎস	
সোনালী ব্যাংক	
অগ্রণী ব্যাংক	
জনতা ব্যাংক	
রূপালী ব্যাংক	
সমবায় ব্যাংক	
গ্রামীণ ব্যাংক	
কৃষি ব্যাংক	
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	
ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স	
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নেতৃত্বের প্রকারভেদ কয়টি?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

২। ব্যবস্থাপনা হলো–

ক. ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার কৌশল।

খ. উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ক্রেতার নিকট পণ্য পৌঁছে দেওয়া।

গ. কৌশলে অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া।

ঘ. বাজারের চাহিদা যাচাইয়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

"ধানসিড়ি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর" স্থাপনের পূর্বে জনাব তাহসিন কতকগুলো অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেমন– কোথায় এটি স্থাপন করবেন, কাকে দিয়ে পরিচালনা করবেন, অর্থসংস্থান কীভাবে হবে ইত্যাদি। এতে তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সময় ক্ষেপণ কম হয়। বর্তমানে তিনি সুনামের সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করছেন।

৩। "ধানসিড়ি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর" স্থাপনের পূর্বে জনাব তাহসিনের কাজটি নিম্নের কোনটির সাথে সংগতিপূর্ণ?

ক. পরিকল্পনা খ. বাজার চাহিদা

গ. প্রকল্প নির্বাচন ঘ. সংগঠন

৪। ব্যবসায় স্থাপনের ক্ষেত্রে তাহসিনের পদক্ষেপটি–

i. লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হবে

ii. কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে

iii. ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। "হাসি-খুশি নকশী ঘর" জামালপুরের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। এর স্বত্বাধিকারী জনাব মাহিন অনেক ভেবেচিন্তে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেন। প্রয়োজনে কর্মীদের পরামর্শ দেন। দীর্ঘ মেয়াদে সফলতা বজায় রাখার নিমিত্তে নকশী কাঁথা ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরির জন্য দক্ষ কারিগরের গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি কর্মী নিয়োগ দেন এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ক. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে?

খ. "প্রেষণা দান" বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব মাহিনের কাজটি কী বর্ণনা কর।

ঘ. "হাসি–খুশি নকশী ঘর" স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হওয়ার পিছনের কারণ-বিশ্লেষণ কর।

২। ইয়াফী ও শাফী দুই বন্ধু। তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি অবস্থিত। ইয়াফী ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে কর্মীদের সাথে আলোচনা করে তাদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাফী কর্মীদের উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন নয়। কর্মীদের অসন্তোষের কারণে শাফীর ব্যবসায়টি ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়।

ক. যিনি নেতৃত্ব দেন তাকে কী বলে?

খ. "জেন্ডার সচেতনতা" কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. ইয়াফী কোন ধরনের নেতা? বর্ণনা কর।

ঘ. "কর্মীদের উপর প্রভাব বিস্তারের অক্ষমতাটি শাফীর ব্যর্থতার কারণ"-মূল্যায়ন কর।

নবম অধ্যায়

বিপণন

Marketing

রসুলপুর গ্রামের রাফিনা দশম শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবা এলাকার একজন সুপরিচিত সবজি চাষি। তিনি নিজের জমিতে ঢেঁড়শ, টমেটো, শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, বেগুনসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেন। জমিতে যখন সবজিগুলো বড় হয় তখন দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। সবজিগুলো যখন বিক্রির জন্য তোলেন, গ্রামের অনেকে সেখান থেকেই সবজি কিনে নেন। বাকি সবজিগুলো তিনি ভালো করে ধুয়ে-মুছে বড় ডালিতে সুন্দর করে সাজিয়ে বাজারে নিয়ে যান। সবজিগুলো যাতে নষ্ট না হয় সে দিকেও তিনি খেয়াল রাখেন। রাফিনা সুযোগ পেলে এবং ছুটির দিনে তার বাবাকে সবজি বাগান পরিচর্যা ও সবজি উত্তোলনে সাহায্য করে। আশে-পাশের গ্রামের লোকেরাও তার সবজি পছন্দ করে কেনেন। তার বাবার সুনামের জন্য সে গর্ববোধ করে।

উপরে বর্ণিত রাফিনার বাবার সবজি উৎপাদন, সবজি সংরক্ষণ, ক্রেতাদের নিকট সবজি বিক্রি পর্যন্ত সকল কাজকে বিপণন বলা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা বিপণনের ধারণা, কার্যাবলি, বিজ্ঞাপনসহ বিপণনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানব।

অধ্যায়টি পাঠ শেষে আমরা

- বিপণনের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- বিপণনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বণ্টন প্রণালীর ধারণা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন পণ্যের বিপণন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- বিজ্ঞাপনের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিজ্ঞাপনের মাধ্যমগুলোর নাম বলতে পারব ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিক্রয়িকতার ধারণা ও আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণগুলো বর্ণনা করতে পারব।

- **বিপণনের ধারণা (Concept of Marketing)**

সাধারণ অর্থে পণ্য-দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকে বিপণন বলে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিপণনের ধারণা আরো ব্যাপক। পণ্য-দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সকল কাজকে বিপণন বা বাজারজাতকরণ বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, প্রমিতকরণ, পর্যায়িতকরণসহ যাবতীয় কাজের সমষ্টি হলো বিপণন।

আধুনিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিপণনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ পণ্যের উৎপাদনের উপরই শুধু কোনো ব্যবসায় সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে না, যদি না সে পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো যায়। বিপণনের মাধ্যমে ক্রেতা ও ভোক্তাগণ মানসম্মত পণ্য বা সেবা পেয়ে থাকে। কার্যকর বিপণন উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিপণনের উন্নয়নের সাথে সাথে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবার উন্নতি সাধিত হয়। এর ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

- **বিপণনের কার্যাবলি (Functions of Marketing)**

বিপণন উৎপাদনকারী এবং ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। বিপণনের মাধ্যমে পণ্য ও সেবার মালিকানাগত, স্থানগত ও সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়। নিম্নে বিপণনের কাজগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

১. **ক্রয় (Buying) :** ক্রয় বিপণনের অন্যতম কাজ। নিজস্ব ব্যবহার বা পুনঃবিক্রয়ের জন্য পণ্য-দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী ক্রয় করতে হয়। পণ্য-দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা সৃষ্টি হয়।

২. **বিক্রয় (Selling) :** বিপণনের একটি আবশ্যকীয় কাজ হচ্ছে পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাকে একত্রিত করা। বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর হয়। পণ্য বা সেবার চাহিদা নির্ধারণ, ক্রেতা অনুসন্ধান, মূল্যনির্ধারণ বিক্রয়ের সাথে জড়িত।

৩. **পরিবহন (Transportation) :** পরিবহন পণ্য বা সেবার স্থানগত উপযোগ ও চাহিদা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছানো হয়। এভাবে পণ্য উৎপাদনকারী থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে। পরিবহনের কারণেই চীনের তৈরি বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস দ্রব্য-সামগ্রী আমরা ব্যবহার করতে পারছি। আবার আমাদের দেশের চিংড়ি মাছ ও চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ভোগ করতে পারছে।

৪. **গুদামজাতকরণ (Warehousing) :** গুদামজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়। বিপণনের সকল পর্যায়ে পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। অনেক পণ্য বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয় কিন্তু ব্যবহার হয় সারা বছর। বছরব্যাপী চাহিদা মেটানোর জন্য সে সকল পণ্য গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সরক্ষণ করতে হয়। যেমন শীতকালে উৎপাদিত গোল আলু ও টমেটো সারা বছর আমরা গুদামজাতকরণের ফলেই পেয়ে থাকি।

৫. **প্রমিতকরণ (Standardizing) :** প্রমিতকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ, আকার, রং, স্বাদ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পণ্য মূল্য স্থির করা হয়। ফলে পণ্যের বিপণন প্রক্রিয়া সহজ হয় এবং বিক্রয় কার্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৬. **পর্যায়িতকরণ (Grading) :** মান অনুযায়ী পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করাকে পর্যায়িতকরণ বলা হয়। সাধারণত ওজন, আকার ও গুণাগুণ অনুযায়ী পর্যায়িতকরণ করা হয়। ফলে বিক্রয় সহজ হয়।

৭. **মোড়কিকরণ (Packaging) :** পণ্য সামগ্রীকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা এবং নষ্ট বা ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু দ্বারা আবৃত করাকে মোড়কিকরণ বলা হয়। শিল্পজাত পণ্য যেমন- ফ্রিজ, টেলিভিশন, সাবান এবং কৃষিজাত পণ্য যেমন- পাস্তুরিত দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদির বিক্রয় ও ক্রেতাদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা মোড়কিকরণের উপর নির্ভর করে।

৮. **তথ্য সংগ্রহ (Collection of Information) :** পণ্য ও বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করাও বিপণনের কাজ। বাজারে কোন পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ কেমন, ক্রেতা ও ভোক্তাদের পছন্দ ও রুচি কেমন সে সম্পর্কে জানতে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

৯. **ভোক্তা বিশ্লেষণ (Consumer Analysis) :** বিপণনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর রুচি, চাহিদা, বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা। কারণ যথাযথভাবে এ কাজটি না করতে পারলে ব্যবসায়িক ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং প্রসার ব্যাহত হয়।

কর্মপত্র–১ : উপরের আলোচনার আলোকে দলীয় কাজের মাধ্যমে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিপণনের গুরুত্ব চিহ্নিত কর
• • • • • • • •

- **বণ্টন প্রণালীর ধারণা (Concept of Distribution Channel)**

উৎপাদনকারী পণ্য উৎপাদন করার পর কখনো কখনো সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু সব সময় তার পক্ষে সরাসরি পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। প্রয়োজন হয় মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর। মধ্যস্থ ব্যবসায়ীগণ উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। বিপণনের অংশ হিসেবে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসেবে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীর সাহায্য নিতে হয়। যে প্রক্রিয়ায় পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী থেকে প্রকৃত ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর হাতে পৌঁছে তাকে বণ্টন প্রণালী বলা হয়। যেমন চা বাগানে উৎপাদিত চা ভোক্তাগণ সরাসরি উৎপাদনকারী থেকে ক্রয় করে না। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পাইকার চা ক্রয় করে। পাইকার থেকে ক্রয় করে খুচরা ব্যবসায়ী। খুচরা ব্যবসায়ী থেকে ভোক্তাগণ চা ক্রয় করে থাকে। এভাবেই উৎপাদনকারীর নিকট থেকে পণ্য বা সেবার মালিকানা একটি পথ ধরে গমন করে শেষ পর্যন্ত ভোক্তার নিকট পৌঁছে।

- **বণ্টন প্রণালী ও বিভিন্ন পণ্যের বিপণন (Distribution Channel and Marketing of Different Goods) :**

পণ্য বা সেবার ধরন ও বৈশিষ্ট্যের উপর বণ্টন প্রণালীর ধরন নির্ভর করে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার পণ্যের বণ্টন প্রণালী দেখানো হলো–

১. **সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় :** কোনো ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সাহায্য ছাড়াই উৎপাদনকারী সরাসরি ভোক্তার নিকট পণ্য বিক্রয় করলে তাকে সরাসরি বিপণন বলা হয়। কিছু কিছু কৃষিপণ্য যেমন- ধান, ফলমূল, সবজি এবং শিল্পজাত দ্রব্য যেমন- গুড়, চিনি ইত্যাদি সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করা হয়।

২. **খুচরা ব্যবসয়ীর মাধ্যমে বিক্রয় :** অনেক ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয় বা বণ্টনে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসেবে খুচরা ব্যবসায়ীর সাহায্য নেওয়া হয়। উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য নিজেরা ও খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। খুচরা ব্যবসায়ীগণ তাদের দোকানে পণ্য রেখে ভোক্তাদের নিকট চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করে থাকে। সাধারণত ধান, চাল, গোল আলু , সাবান, বিস্কুট, সেমাই ইত্যাদি এ পদ্ধতিতে বিক্রয় ও বণ্টন করা হয়। উৎপাদনকারী স্থানীয় হাট-বাজারে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করে থাকে।

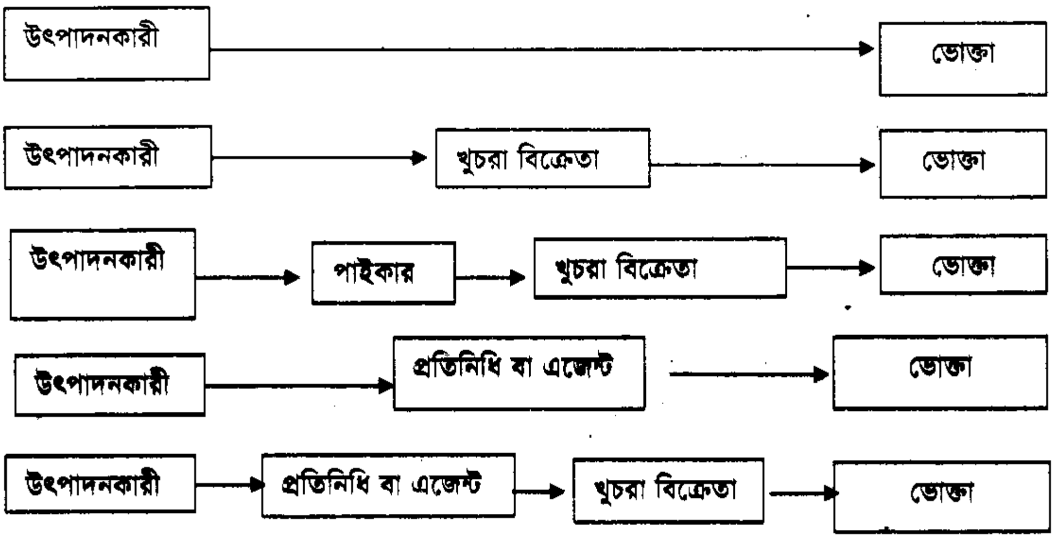

৩. **পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বিক্রয় :** এ পদ্ধতিতে উৎপাদনকারী তার উৎপাদিত পণ্য পাইকারের নিকট বিক্রয় করে এবং খুচরা ব্যবসায়ী সে পণ্য পাইকারের নিকট থেকে ক্রয় করে ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে। যে সকল জায়গায় প্রচুর পরিমাণ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত হয় সেখানে পাইকারগণ উপস্থিত হয়ে সে সকল পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে থাকে। সাধারণত ধান, পাট, সরিষা, আম, কলা, বিভিন্ন রকম সবজি পাইকারি ব্যবসায়ীগণ ক্রয় করে থাকে। আবার বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী যেমন কাগজ, কলম ইত্যাদি পাইকার ক্রয় করে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তা খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট পৌঁছায়।

৪. **প্রতিনিধি বা এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রয় :** উৎপাদনকারীগণ অনেক সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে সরাসরি ভোক্তাদের নিকট শিল্প সামগ্রী বিক্রয় করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী যেমন- টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান এবং কৃষি উপকরণ যেমন সার, বীজ এ পদ্ধতিতে বিপণন হয়ে থাকে।

৫. **প্রতিনিধি ও খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে বিক্রয় :** উৎপাদনকারী দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত তাদের প্রতিনিধিদের ফরমায়েশ ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করে এবং এজেন্ট বা প্রতিনিধিগণ নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে ঘুরে ঘুরে সে সকল সামগ্রী খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করে। ভোক্তাগণ এ সকল সামগ্রী খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কিনে থাকে। বিভিন্ন রকম কোমল পানীয় ও প্রসাধনী সামগ্রী আমাদের দেশে এ জাতীয় বণ্টন প্রণালীতে বিক্রয় হয়ে থাকে।

কর্মপত্র–২: তোমাদের পরিবারের নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রীর তালিকা প্রণয়ন কর এবং কোন বণ্টন প্রণালীতে সেগুলো ক্রয় করা হয়েছে তা চিহ্নিত কর।	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	
১০	

- **বিজ্ঞাপনের ধারণা (Concept of Advertising)**

ছুটির পর ইফরান স্কুলের গেইটে একজন লোককে একটি কাগজ বিলি করতে দেখল। তাকেও একটি দিল। সেটিতে লেখা ছিল তাদের বাজারে নতুন একটি স্টেশনারি দোকান খুলতে যাচ্ছে। যেখানে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকমের খাতা-পত্র, পেন-পেন্সিল, ব্যাগসহ অন্যান্য জিনিসপত্র সুলভমূল্যে পাওয়া যাবে। উদ্বোধন উপলক্ষে সকল ক্রেতাকে একটি করে রঙিন ক্যালেন্ডার উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। বাসায় ফেরার পর তার বড় ভাইকে দেখালে তিনি বললেন এটি হচ্ছে একটি লিফলেট। ব্যবসায়িক প্রচারের জন্য এগুলো বিতরণ করা হয়।

উপরের ঘটনায় স্টেশনারি দোকানের জন্য ক্রেতাসাধারণের উদ্দেশে প্রচারিত লিফলেটটি বিজ্ঞাপনের একটি মাধ্যম। বিজ্ঞাপন হচ্ছে পণ্য বা সেবা সামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি উপায় বা কৌশল। প্রতিদিন আমরা টিভি, রেডিও ও পত্রিকায় বিভিন্ন পণ্যের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দেখি ও শুনে থাকি। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে খুব সহজেই ক্রেতাসাধারণকে পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করা যায়। বিজ্ঞাপনের অন্যান্য মাধ্যম হচ্ছে লিফলেট, ম্যাগাজিন, পরিবহন, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, ইন্টারনেট ইত্যাদি।

একটি বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড

বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম (Different Types of Media of Advertising)

বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। সব ধরনের ব্যবসায় জন্য কিংবা সব ধরনের পণ্যের জন্য একই বিজ্ঞাপন মাধ্যম ব্যবহার করা হয় না। পণ্যের চাহিদা, গুণাগুণ, মূল্য ও ক্রেতাদের কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করতে হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন মাধ্যম ও এদের প্রকৃতি তুলে ধরা হলো।

বিজ্ঞাপন মাধ্যম	ধরন
সংবাদপত্র (Newspaper)	বিভিন্ন প্রকার দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের বিভিন্ন পৃষ্ঠা ও নির্ধারিত পৃষ্ঠা
সাময়িকী (Periodicals)	সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক সাময়িকী, ভোক্তা সাময়িকী, কৃষি সাময়িকী, মহিলা সাময়িকী, অর্থ সাময়িকী ইত্যাদি
প্রচারপত্র (Circular Letter)	পণ্য সামগ্রীর গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান উল্লেখপূর্বক মুদ্রিত প্রচারপত্র
বিজ্ঞপনীফলক (Hoarding)	গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তার পাশে কাঠ বা হার্ডবোর্ডের বিজ্ঞাপনী ফলক
প্রাচীরপত্র (Poster)	জনসাধারণের চলাফেরা যেখানে বেশি, সেখানের দেয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি ও লেখাযুক্ত প্রাচীরপত্র
টেলিভিশন (Television)	টেলিভিশনে বিভিন্ন পণ্যের আকর্ষণীয় দর্শন-শ্রবণযোগ্য স্লাইড
রেডিও (Radio)	স্পট বিজ্ঞাপন, সৌজন্য বিজ্ঞাপন, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, জিঙ্গোল, জাতীয় বিজ্ঞাপন, আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন
চলচ্চিত্র (Cinema)	সিনেমা হলে ছবি শুরুর আগে, মধ্য বিরতিতে এবং শেষে স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রদর্শিত বিজ্ঞাপন
পণ্যসজ্জা (Window Display)	সাধারণত কাঁচের গ্লাস দ্বারা বিভিন্ন রকমের পণ্য সাজিয়ে রাখা
মেলা বা প্রদর্শনী (Fair/Exhibition)	বৈশাখী মেলা, শিল্প মেলা, বাণিজ্য মেলা, কুটির শিল্প মেলা, মীনাবাজার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার
নমুনা (Sample)	ক্রেতাকে বিভিন্ন রকম নমুনা প্রদান। সাধারণত ঔষধ কোম্পানি, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রসাধন সামগ্রীর নমুনা বিতরণ করা
নিয়ন আলো (Neon sign)	শহরের কর্মস্থল ও জনবহুল এলাকায় বৈদ্যুতিক নিয়ন আলোর মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের আলোকসজ্জা ।
পরিবহন বিজ্ঞাপন (Car Advertising)	বিভিন্ন যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী গাড়িতে বিজ্ঞাপন প্রচার। চলচ্চিত্র, সাবান, সিগারেট, কোমল পানীয়ের জন্য পরিবহন বিজ্ঞাপন ব্যবহার।
অন্যান্য	ব্যানার, ফ্যাস্টুন, সাইনবোর্ড, স্টিকার, গ্যাস বেলুন, আকাশ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব (Importance of Advertising)

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক যুগে ছোট, মাঝারি, বড় যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পণ্য সামগ্রীর বিপণনের জন্য বিজ্ঞাপন খুবই কার্যকর মাধ্যম। নিম্নে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো :

১. বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের মান, মূল্য ও ব্যবহারবিধি ক্রেতা বা জনসাধারণের কাজে তুলে ধরা হয়। ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

২. বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি পায় যা ব্যবসায়ের একটি বড় সম্পদ। সুনাম বৃদ্ধির কারণে ব্যবসায়ের প্রসার হয়। আবার ব্যবসায়ের সুনাম ধরে রাখার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩. বিজ্ঞাপন পণ্যের প্রচারে গতিশীলতা আনে। পণ্যের চাহিদা, বিক্রয় ও মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং দেশের জাতীয় আয় বাড়ে।

৪. বিজ্ঞাপনে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসায়ীরা সে চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং পণ্য বা সেবার মূল্যের স্থিতিশীলতা আসে।

৫. বিজ্ঞাপনের প্রভাবে পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায় ও বেকার সমস্যার সমাধান হয়।

৬. বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসাধারণ নতুন নতুন পণ্য ও সেবা সামগ্রী সম্পর্কে জানতে পারে। এতে তাদের মধ্যে ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। মানসম্মত পণ্য ভোগ করার মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৭. বিজ্ঞাপন সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ স্বরূপ-পণ্যের দোষ-গুণ সম্পর্কে সচেতনতা, ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা, এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা রয়েছে।

৮. বিজ্ঞাপন জনসাধারণের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে দেশীয় পণ্য ব্যবহার ও ক্রয়ে ভূমিকা রাখে। 'স্বদেশী পণ্য কিনে হউন ধন্য' জাতীয় বিজ্ঞাপন দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে লালন করতে উৎসাহ যোগায়।

কর্মপত্র–৩ : তোমরা প্রতিদিন বিভিন্ন মাধ্যমে যে সকল পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে থাক সে সকল পণ্যের একটি তালিকা তৈরি কর	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

কোন কোন বিজ্ঞাপন তোমাকে কীভাবে আকৃষ্ট করেছে তার কারণ লিখ	
• বিজ্ঞাপনের নাম	• আকৃষ্ট হবার কারণ
	•
	•
	•
	•
	•

- **বিক্রয়িকতার ধারণা (Concept of Salesmanship)**

বিক্রয়িকতা বলতে বিক্রয়কর্মীর ক্রেতা আকর্ষণ করার কৌশল বা দক্ষতাকে বোঝায় যার মাধ্যমে সে সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট পণ্য বা সেবা সামগ্রী বিক্রয় করতে সক্ষম হয়। বিক্রয়িকতার গুণে বিক্রেতা তার ব্যবসায় ও পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করে তাদেরকে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করে।

- **আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলি (Qualities of a Good Salesman)**

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রসার ও সফলতা অর্জনে বিক্রয়কর্মীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা একজন বিক্রয়কর্মী দ্বারা প্রভাবিত হয়। ক্রেতা ও ভোক্তাদের আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করতে হলে একজন বিক্রয়কর্মীকে অনেকগুলো গুণের অধিকারী হতে হয়। নিম্নে একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলি বিশ্লেষণ করা হলো।

শারীরিক গুণাবলি
১. **সুদর্শন চেহারা** : একজন বিক্রয়কর্মী সুন্দর ও আকর্ষণীয় হলে সে সহজেই ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।
২. **সুস্বাস্থ্য** : একজন বিক্রয়কর্মীকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হয়। কারণ সুস্বাস্থ্য গ্রাহকদেরকে আকৃষ্ট করে।
৩. **সুন্দর হাসি** : বিক্রয়কর্মীর হাসিমাখা মুখ ক্রেতাদেরকে বাড়তি অনুপ্রেরণা দেয়।
মানসিক গুণাবলি
৪. **আগ্রহ ও আন্তরিকতা** : একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীকে তার কাজের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকতে হয়। ক্রেতাদের প্রতি আন্তরিকতা ও নিজ পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি করে।
৫. **আত্মবিশ্বাস** : বিক্রয়কর্মীকে অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী হতে হবে যাতে সে তার দোকানের পণ্য ক্রেতাদের নিকট গ্রহণীয় করে তুলতে পারে।
৬. **তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা** : ক্রেতাদের আগ্রহ, মনোভাব ও আচরণ অনুধাবন করা এবং যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সহজে মোকাবেলা করার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা একজন আদর্শ বিক্রয়কমীর থাকা বাঞ্ছনীয়।
৭. **ধৈর্যশীলতা** : একজন বিক্রয়কর্মীকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে।
নৈতিক গুণাবলি
৮. **সততা ও বিশ্বস্ততা** : একজন বিক্রয়কর্মীকে অবশ্যই তার কাজে ও গ্রাহকদের সাথে লেনদেনে সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে। সততা ও বিশ্বস্ততা ক্রেতাদেরকে স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করে।
৯. **মার্জিত ব্যবহার** : বিক্রয়কর্মীকে অবশ্যই ভদ্র, নম্র, অমায়িক ও মার্জিত ব্যবহারের অধিকারী হতে হয়।
১০. **মেলামেশার ক্ষমতা** : একজন বিক্রয়কর্মীর মধ্যে ক্রেতাদের সাথে সহজে মেশার গুণ থাকা উচিত যাতে সে সহজেই ক্রেতাদের আপন করে নিতে পারে এবং স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত করতে পারে।
১১. **জেন্ডার সচেতনতা** : নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে এবং বয়স্ক ক্রেতাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে সচেতন বিক্রয়কর্মীর সচেতন থাকা উচিত।
১২. **ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি** : একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মী ক্রেতাদের সকল বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ক্রেতা বা গ্রাহকগণ কোন পণ্যের মান ও মূল্য সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করলেও তাকে হাসিমুখে প্রভাবিত করতে হবে।

অন্যান্য গুণাবলি
১৩. শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা : একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর অবশ্যই প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকা উচিত যাতে সে ব্যবসায়ের বিভিন্ন জ্ঞান প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে।
১৪. বিপণন সম্পর্কে জ্ঞান : একজন বিক্রয়কর্মীর পণ্য বিপণনের সাথে জড়িত বিভিন্ন কাজ যেমন পণ্য নির্বাচন, পণ্য সংগ্রহ, মূল্য নির্ধারণ, পর্যায়িতকরণ, প্যাকিং সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা উচিত।
১৫. হিসাবে পারদর্শিতা : একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর অবশ্যই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও হিসাবরক্ষণের কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা ও জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

কর্মপত্র–৪ : একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর কোন গুণগুলো তোমার মধ্যে আছে এবং কোন গুণগুলোর আরো উন্নতি প্রয়োজন আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে তা চিহ্নিত কর

বিক্রয়কর্মীর গুণ	যে গুণগুলো আছে (টিক দাও)	যে গুণগুলোর আরো উন্নতি প্রয়োজন (টিক দাও)
আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব		
সুস্বাস্থ্য		
সুন্দর হাসি		
আগ্রহ ও আন্তরিকতা		
তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা		
ধৈর্যশীলতা		
সততা ও বিশ্বস্ততা		
মেলামেশার ক্ষমতা		
জেন্ডার সচেতনতা		
শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা		
বিপণন সম্পর্কে জ্ঞান		
হিসাবে পারদর্শিতা		
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি		

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বিপণনের অন্যতম কাজ কী?

ক. ক্রয় খ. বিক্রয়

গ. পরিবহন ঘ. গুদামজাতকরণ

২। পণ্যের বিজ্ঞাপন কেন করা হয়?

ক. পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

খ. পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের ধারণা দিতে।

গ. পণ্যের বাজার সম্পর্কে জানার জন্য।

ঘ. উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যে।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রুবেল একজন তরমুজ উৎপাদনকারী। উৎপাদিত তরমুজ তিনি নিজেই বহন করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি পণ্য বিক্রির জন্য অন্য কৌশল অবলম্বন করার চিন্তা করছেন।

৩। রুবেলের ক্ষেত্রে পণ্য বণ্টন প্রণালীটি হলো–

ক. উৎপাদনকারী–ভোক্তা
খ. উৎপাদনকারী–খুচরা কারবারি
গ. উৎপাদনকারী–খুচরা ব্যবসায়ী–ভোক্তা
ঘ. পাইকার–খুচরা ব্যবসায়ী

৪। রুবেলের সঠিক বণ্টন প্রণালী ব্যবহারের ফলে–

i. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পায়।

ii. ক্রেতা কমমূল্যে পণ্য পেয়ে থাকে।

iii. বিপণন কার্য সহজ হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শুভর দোকানের পাশে একই ধরনের আরও একটি দোকান গড়ে উঠায় বিক্রির পরিমাণ কমে যায়। বিক্রয় বাড়ানোর কৌশল হিসেবে শুভ দেখতে ভালো, সদালাপী এরকম একজন বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেন। কিছুদিন পর তার দোকানে বিক্রির পরিমাণ আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

ক. কী দ্বারা পণ্যকে আকর্ষণীয় করা যায়?
খ. প্রমিতকরণ কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. শুভ বিক্রয়কর্মী নিয়োগে কোন ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করেছেন।
ঘ. বিক্রয় বৃদ্ধিতে শুভর গৃহীত পদক্ষেপটি মূল্যায়ন কর।

২. বড় রাস্তার পাশে 'আদর স্টোর' নামে নতুন একটি দোকান আছে। কিন্তু কোনো কারণে দোকানটির বিক্রি ভালো নয়। সম্প্রতি দোকানের মালিক তার দোকানের পরিচিতি, সেবার ধরন, পণ্যের মান ও বিভিন্ন প্রকার পণ্যের নাম লিখিত একটি মুদ্রিত কাগজ পত্রিকার হকারের মাধ্যমে এলাকার বাসায় বাসায় পৌঁছে দিলেন। কিছুদিন পর দেখা গেল তার দোকানে ক্রেতার সমাগম ও বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. বণ্টন প্রণালীতে সবশেষে কার অবস্থান?
খ. পর্যায়িতকরণ কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে আদর স্টোরের মালিক প্রচারের কোন মাধ্যমটি বেছে নিল? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মালিকের গৃহীত পদক্ষেপ বিক্রয় বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল' মতামত দাও।

দশম অধ্যায়

ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সহায়ক সেবা

Assistance for Entrepreneurship Development

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনেক ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন রকম সহায়তা একজন উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করে। এ অধ্যায়ে আমরা ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিল্পনীতি, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সেবা সম্পর্কে জানতে পারব।

এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে আমরা

- সহায়ক সেবার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশে ব্যবসায়ের সহায়ক সেবার ধরন ও উৎসগুলোর নাম বলতে পারব।
- শিল্পনীতিতে উল্লিখিত সহায়তার ধরনগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরন বর্ণনা করতে পারব।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরন বর্ণনা করতে পারব।
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরন বর্ণনা করতে পারব।
- অন্যান্য উৎস হতে প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরন বর্ণনা করতে পারব।

- **উদ্যোগ উন্নয়নে সহায়ক সেবার ধারণা (Concept of Assistance for Entrepreneurship)**

নতুন ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপন একটি সৃজনশীল ও গঠনমূলক কাজ। কিন্তু এর সাথে ঝুঁকিও জড়িত। ফলে সহজেই কেউ এ কাজে এগিয়ে আসতে চায় না। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের সহায়তা। উদ্যোগ গ্রহণের এসব সহায়তা একজন সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাতে ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপন ও তা সফলভাবে পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করে। প্রকৃতি অনুয়ায়ী এসব সহায়তাকে উদ্দীপনামূলক, সমর্থনমূলক ও সংরক্ষণমূলক এ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে বোঝায় বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিতকরণ, শিল্প স্থাপনে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার, কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ দানকে বোঝায়। সমর্থনমূলক সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপন, পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকরণ, পুঁজির সংস্থান, অবকাঠামোগত সহায়তা, কর অবকাশ, ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমর্থনমূলক সহায়তা। অন্যদিকে সংরক্ষণমূলক সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো দুর করা হয়।

সহায়তার বিভিন্ন উৎস

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ ও স্থাপনে সহায়তাকারী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান দেশে ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ, শিল্প স্থাপন ও পণ্য-দ্রব্যের বিপণনে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। তাছাড়া জাতীয় শিল্পনীতিতে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হয়েছে যা অনেকের জন্য অনুপ্রেরণামূলক হতে পারে। নিম্নে এগুলোর তালিকা প্রদান করা হলো–

সহায়তার বিভিন্ন উৎস
১. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা
২. বাংলাদেশে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক
৪. বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা সংস্থা
৫. বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ
৬. যুব অধিদপ্তর
৭. মহিলা অধিদপ্তর
৮. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে গণপরিষদে একটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন প্রতিষ্ঠার বিল উপস্থাপন করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৭ সালের ৩০ মে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠিত হয় যা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) নাম ধারণ করে। ২০১২ সালে বিসিকের গৌরবময় ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। বর্তমানে শিল্প

মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের প্রধান সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। এ সংস্থার প্রধান কাজ হলো এ জাতীয় শিল্পখাতের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগে পরামর্শদান। বিসিক প্রদত্ত অন্য সহায়তাগুলো নিম্নরূপ–

- শিল্পসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ
- উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ
- শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন
- প্রকল্প নির্বাচন
- প্রকল্প মূল্যায়ন
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন
- পণ্য ডিজাইন
- কাঁচামাল সরবরাহে সাহায্য
- উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিপণনে সহায়তা
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের রেজিস্ট্রেশন

উল্লেখিত সহায়তাদি ও শিল্প স্থাপনসম্পর্কিত যে কোনো পরামর্শের জন্য উদ্যোক্তাগণকে প্রত্যেক জেলায় অবস্থিত বিসিকের শিল্পসহায়ক কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। ২০১২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে ৭৪টি শিল্প নগরী কার্যালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ৪২৭৭টি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এ সমস্ত শিল্প কারখানায় ৩৩ লাখ ৮১ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (Bangladesh Development Bank Limited)

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা একত্রিত হয়ে ৩রা জানুয়ারি ২০১০ সাল হতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড নামে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ছাড়াও বিডিবিএল সরকারি ও বেসরকারি শিল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে নতুন শিল্প প্রকল্প স্থাপন, চালু শিল্প প্রকল্পগুলোর আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি পরিবর্তন ও সম্প্রসারণের জন্য শিল্প উদ্যোক্তাদের ঋণ ও পরামর্শদান ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রধান কাজ। এছাড়া বিডিবিএল-এর উল্লেখযোগ্য সহায়তাগুলো হলো–

ক. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার

[বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) ভূমিকা অনস্বীকার্য।] এ খাতটি শ্রমঘন হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দ্রুত অবদান রাখতে সক্ষম।

এসএমইকে 'Employment Generating Machine' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমেই কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব লাঘব ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা বেশি। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী বিডিবিএল শাখাগুলো এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার অন্যূন ৪০% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করে থাকে। অবশিষ্ট অংশ বিতরণ করে মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে ।

খ. উৎপাদন ও সেবা খাতকে অগ্রাধিকার

দেশে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবসা খাতের চেয়ে শিল্প ও সেবা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। তাই বিডিবিএল শাখাসমূহকে উৎপাদনমুখী শিল্প ও কৃষিভিত্তিক সেবা খাতে ঋণ বিতরণে সচেষ্ট থাকতে হয়।

গ. নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার

যদি কোনো নারী ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী হন কিংবা অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে অর্থনীতির মূল স্রোতে নারীদের অংশগ্রহণ একান্তভাবেই অপরিহার্য। আমাদের নারী সমাজের নিষ্ঠা, আগ্রহ, উদ্ভাবন শক্তি ও শ্রম নিপুণতা রয়েছে। বিশেষ করে মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম ও পোশাক শিল্পে নারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণ শিল্পায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এ জন্য বিডিবিএল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে সহজ শর্তে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রদান করছে।

ব্যাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

দেশের চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক) এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সারা দেশে বিরাজমান তাদের শাখাগুলোর মাধ্যমে শিল্প ও ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবা প্রদান করে আসছে। বিশেষ করে নিবিড় শ্রমঘন ও কর্মসংস্থানমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্রুত প্রসারের জন্য বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে এসএমই খাতের উন্নয়নে একমালিকানা, অংশীদারি, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যবসায় বা প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী ঋণসীমা সর্বনিম্ন ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা। ঋণের মেয়াদ ব্যবসায় বা প্রকল্পের উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। তবে চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে ১ বৎসর এবং মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ৩-৭ বছর পর্যন্ত বিবেচিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা নিম্নরূপ :

- ঋণপ্রার্থী উদ্যোক্তাকে ন্যূনতম ২ বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- উদ্যোক্তাকে সুস্থ, শিক্ষিত এবং বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
- ঋণখেলাপী, দেউলিয়া, উন্মাদ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।
- উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
- মহিলা উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড (Bangladesh Small Industries and Commerce Bank Limited- BASIC)

বেসিক ব্যাংক বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধীন ১৯৮৮ সালে নিবন্ধিত হয় এবং ১৯৮৯ সালের ৩১ শে জানুয়ারি থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এটি ব্যাংকিং কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র শিল্পের অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হলেও বর্তমানে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক ব্যাংকিং কার্যক্রম উভয়ই পরিচালনা করে থাকে। তবে ব্যাংকের স্মারকলিপিতে উল্লেখ অনুযায়ী ব্যাংক তার মোট ঋণযোগ্য তহবিলের ৫০% ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যাংক মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থায়ন করছে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে তৈরি পোশাক, কৃষিভিত্তিক শিল্প যেমন- পোল্ট্রি, প্রকৌশল, খাদ্য ও খাদ্য জাতীয় শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ঔষধ শিল্প, কাগজ, বোর্ড তৈরি, প্রকাশনা ও প্যাকেজিং শিল্প, চামড়া ও পাট শিল্প। বেসিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বিগত কয়েক বছরের শিল্প ঋণের খতিয়ান নিম্নে দেওয়া হলো-

বছর	কোটি টাকা
২০০৫	৯৯৮.৭৫
২০০৬	১২২৪.৩৫
২০০৭	১৩৯০.১৪
২০০৮	১৭২২.৬৪
২০০৯	১৭৮২.৫৪
২০১০	২৭৭৭.৭৯
২০১১	৩৩৩২.৩১

সূত্র : বেসিক ব্যাংক।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য কেন্দ্র (Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre-BITAC)

দেশের শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থাটি প্রদত্ত সহায়তাগুলো হলো কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, নতুন ডিজাইন ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত করানো ও যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে উপদেশ প্রদান। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার, দলগত আলোচনা, প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানদান। চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিটাক তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কেন্দ্রগুলো হলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর ও খুলনায় অবস্থিত। বর্তমানে বগুড়ায় আরেকটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প কাজ করছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (Bangladesh Council for Scientific and Industrial Research)

জাতীয় শিল্পোন্নয়নে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ক সমস্যাবলির উপর গবেষণা করা, গবেষণায় উৎসাহিত করা ও গবেষণা পরিচালনায় পরামর্শ প্রদান করা এ পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ পরিষদ শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার দিকনির্দেশনা, নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে থাকে। একজন ব্যবসায় বা শিল্প উদ্যোক্তা এ পরিষদের আবিষ্কৃত পণ্য বা প্রযুক্তি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করে উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (Directorate of Youth Development)

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব অধিদপ্তর যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত অনেকগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব অধিদপ্তর শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত যুবকদেরকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়, কৃষি খামার, মৌমাছি পালন, গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ, কম্পিউটার শিক্ষা, অফিস ব্যবস্থাপনা, সেলাই ও এমব্রয়ডারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রশিক্ষণের সাথে সাথে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে প্রারম্ভিক পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থাও করে থাকে।

মহিলা অধিদপ্তর (Directorate of Women Affairs)

শহর ও গ্রামের মহিলাদের সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা অধিদপ্তর নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, হস্ত শিল্প, বাটিকের কাজ, বুনন শিল্প, সেলাই ইত্যাদি।

বেসরকারি সংস্থা (Non-government Organizations-NGOs)

উদ্যোক্তা উন্নয়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সংস্থাগুলো মূলত গ্রামীণ বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তদের উদ্যোগী হবার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। বাংলাদেশে অসংখ্য এনজিওর মধ্যে ব্র্যাক-এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ব্র্যাক (BRAC)

২০১০ সালের হিসেব মতে বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এনজিও বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হচ্ছে ব্র্যাক। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জনাব ফজলে হোসেন আবেদের নেতৃত্বে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করলেও বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য নিয়ে এ সংস্থাটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্র্যাক যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলো হলো–

১. **ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রম** : এর মধ্যে রয়েছে কাপড় বুনন, হাঁস-মুরগি পালন, আসবাবপত্র, তৈল উৎপাদন, গুড়, দড়ি, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি, ধান ভানা।

২. **সহযোগী প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন** : এ কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন লোকদেরকে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, বিপণন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়।

৩. **উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়ন** : আধুনিক ডিজাইন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পজাত সামগ্রীর মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া দেশের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প যেমন সিল্ক,জামদানি, নকশিকাঁথা উন্নয়নেও ব্র্যাক কাজ করছে। ব্র্যাকের নিজস্ব ডেইরি ফার্ম ও নিজস্ব বিপণিকেন্দ্র 'আড়ং' রয়েছে।

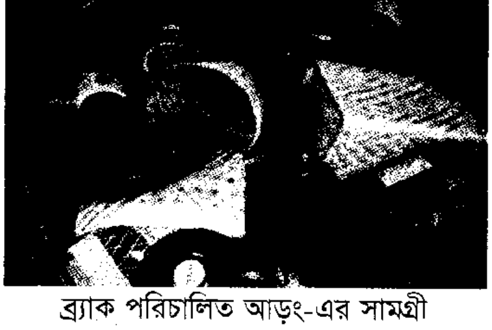

ব্র্যাক পরিচালিত আড়ং-এর সামগ্রী

মাইডাস (Micro Industries Development Assistance Services-MIDAS)

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে মাইডাস ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক, কারিগরি, ব্যবস্থাপনা জাতীয় সহায়তা প্রদান করে। মাইডাসের সামগ্রিক কার্যক্রমগুলো হলো–

১. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ঋণ সুবিধা প্রদান।

২. জাতীয়, বহুজাতিক, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশিক্ষণ, তথ্য ও পরামর্শ সেবা প্রদান।

৩. ব্যবসায় ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালনা।

৪. ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহযোগিতার নেটওয়ার্ক বাড়ানো।

৫. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনে সহায়তা করা।

প্রশিকা (Proshika)

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিকাশে প্রশিকা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কৃষি শিল্প, তাঁত শিল্প, সিল্ক উৎপাদন হস্ত শিল্প, গবাদিপশু পালন, মৌমাছি পালন, চারা উৎপাদনসহ অনেক নতুন পেশা তৈরি করছে প্রশিকা। এসব কাজে অনেক উদ্যোক্তা এগিয়ে এসেছেন এবং প্রশিকা তাদেরকে ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (Thengamara Mohila Sabuj Sangha-TMSS)

উত্তরবঙ্গের জেলা বগুড়াকে কেন্দ্র করে ১৯৮০ সালে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ কাজ শুরু করলেও বর্তমানে সারা দেশেই এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মূলত দরিদ্র ও বিত্তহীন মহিলাদের ঋণ সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করার পাশাপাশি টিএমএসএস দোকান পরিচালনা, হাঁস-মুরগির খামার পরিচালনা, মাছ চাষ, নার্সারি পরিচালনা ও কুটির শিল্প পরিচালনাসহ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০-এ উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সহায়তা

উদ্দীপনামূলক	• নারী ও পুরুষ ব্যবসায়ীরা যাতে সমাজে অর্থনৈতিক পরিবর্তন সংঘটনে সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারে সেজন্য উদ্যোক্তা সংস্কৃতির প্রসারে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ। • উৎপাদনশীল ও সেবা খাতের সফল উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি, জাতীয় উদ্যোক্তা দিবস পালন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষাক্রমের প্রবর্তন। • মানব পুঁজি বিকাশের বেশির ভাগ কার্যক্রম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এবং দেশব্যাপী শুরু করা যুব-সম্প্রদায়কে জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, দেশের উন্নয়ন ও সফলতা এবং সীমিত ভৌত সম্পদের বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে জাতি গঠনমূলক ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ও এ ধরনের শিক্ষাকে উৎসাহিতকরণ।
সমর্থনমূলক	• শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে শিল্প পণ্যের অধিকতর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে টেকসই ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবকদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা। কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং লাগসই প্রযুক্তি নির্বাচন ও প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্প কারখানাসমূহকে সহায়তার লক্ষ্যে বিটাকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ।

	• দেশীয় বিনিয়োগকারীদের বিশেষ করে মাইক্রো, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিনিয়োগকারীদের কাছে সহজলভ্য স্থানীয় ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি গড়ে তোলার জন্য সরকার দেশীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্পকে স্থানীয় কারিগরি ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করতে সুযোগ প্রদান। • ৩০/০৬/২০১১ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কর অবকাশ প্রদান : • তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম দু'বছর আয়ের ১০০% ভাগ, পরবর্তী দু'বছর ৫০% ও শেষ (৫ম) বছর ২৫% ভাগ কর অবকাশ। • (খ) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ এবং তিন পার্বত্য জেলায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ৭ (সাত) বছর মেয়াদি কর অবকাশের মধ্যে প্রথম তিন বছর কর অবকাশের হার ১০০%, পরবর্তী ৩ বছর ৫০% ও শেষ বছরে (৭ম বছর) ২৫%।
সংরক্ষণমূলক	• আইসিটি, লন্ড্রি, পর্যটন ও সেবা, বিউটি পারলার, বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইত্যাদি সেবামূলক খাতসহ মৎস্য, কৃষি ও হস্তশিল্প খাত এবং গবাদি পশু প্রতিপালন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া। • ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তাদান, তাঁতশিল্প রক্ষা, বেনারসি ও জামদানি পল্লীর মত রেশম পল্লী গড়ে তোলাসহ তাঁতি, কামার, কুমার, মৃৎশিল্প, বাঁশ, বেত, তামা, কাঁসা ও পাটি শিল্পে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সমর্থনমূলক সহায়তা কোনটি?

ক. পরামর্শ দান   খ. তথ্য সরবরাহ

গ. পুঁজির সংস্থান   ঘ. ব্যবসায় আধুনিকায়ন

২। শিল্প স্থাপনে সহজে কেউ এগিয়ে আসতে চায় না কেন?

ক. এতে সৃজনশীলতার প্রয়োজন হয়

খ. কাজটি গঠনমূলক বলে

গ. এ কাজে ঝুঁকি নিতে হয় বলে

ঘ. নিজস্ব পুঁজির প্রয়োজন হয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সিলেটের নিশাত আফরিন ২০১১ সালে বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালি সামগ্রী তৈরির একটি প্রকল্প হাতে নেন। উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করতে গিয়ে আর্থিক সংকটে পড়ায় তিনি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হন এবং প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু ঋণ নেন। কর অবকাশ সুবিধা পাওয়ার কারণে দিন দিন তার ব্যবসায়ের উন্নতি হতে লাগল।

৩। নিশাত আফরিন ২০১৫ সালে অর্জিত আয়ের উপর কত ভাগ কর অবকাশ পাবেন।

ক. ১০০%   খ. ৭৫%

গ. ৫০%   ঘ. ২৫%

৪। আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির সহায়তার ফলে প্রধানত–

i. দেশে নারী উদ্যোক্তার উন্নয়ন হবে

ii. বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন সাধিত হবে

iii. দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত জটিলতা ও ঝুঁকির কথা চিন্তা করে জনাব মেহরাজ এ কাজে এগিয়ে আসতে চায়নি। কিন্তু বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত সরকারি ও বেসরকারি সহায়তার কথা শুনে তিনি ঢাকার অদূরে সাভারে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে অল্পদিনেই সফলতা লাভ করেন। সম্প্রতি প্রতিযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে তাঁর পক্ষে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে।

ক. বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ নারী?

খ. বিসিক–এর প্রধান কাজটি কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব মেহরাজ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপনে আগ্রহী হলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বর্তমান পরিস্থিতিতে জনাব মেহরাজের সহায়তার প্রয়োজন আছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২। সায়মা হক ছোটবেলা থেকেই চ্যালেঞ্জিং কাজ করতে পছন্দ করতেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে নারায়ণগঞ্জ বিসিক শিল্প এলাকায় 'সায়মা ফুড প্রডাক্টস' নামে একটি উন্নতমানের ও রপ্তানিমুখী কারখানা স্থাপন করেন। এজন্য তিনি একটি প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা নিয়েছেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

ক. বিসিকের পূর্ণরূপ কী?

গ. মহিলা অধিদপ্তরের প্রধান কাজটি ব্যাখ্যা কর।

গ. সায়মা হকের মতো উদ্যোক্তাদের উপরোক্ত সহায়তা দানে সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সায়মা হকের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

একাদশ অধ্যায়

ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

Ethics in Business and Social Responsibilities

যদিও ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন তবু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি মেনে চলতে হয়। সমাজ ও ব্যবসায় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন ও পালন করতে হয়। এ অধ্যায়ে আমরা ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারব।

পরিবেশ দূষণ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- ব্যবসায়িক মূল্যবোধ, সততা ও নৈতিকতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা ও কর্মচারীদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যবসায়ের কারণে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও ভূমি দূষণের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পরিবেশ দূষণ রোধে ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করতে পারব।
- বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব।

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা (Concept of Business Values and Ethics)

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শব্দ দুটির ধারণা প্রায় অবিচ্ছেদ্য। যে জ্ঞানবোধ এবং আচরণ সমাজ মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করে তাকেই মূল্যবোধ বলে অভিহিত করা যায়। মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক, মঙ্গলময় ও কল্যাণময় দিকের নির্দেশনা দেয়। অন্যায় থেকে ন্যায়, অধর্ম থেকে ধর্ম, অসত্য থেকে সত্য, অনুচিত থেকে উচিত পৃথকীকরণ বা নিরূপণের ক্ষমতা নৈতিক নীতিবোধ থেকে আসে। একটি সুন্দর সুখী সমাজ গঠন এবং দেশের জনগণের জন্য নৈতিক আচরণবিধি অনুসরণ একান্ত আবশ্যক।

নৈতিকতা (Ethics)

নৈতিকতা শব্দটি গ্রিক শব্দ ইথস (Ethos) শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে। যার অর্থ মানব আচরণের মানদণ্ড। নৈতিকতা মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সাথে জড়িত। আমরা জানি একজন শিক্ষকের প্রধান কাজ হলো ছাত্র–ছাত্রীদের সুষ্ঠু পাঠ দান করা। কিন্তু পাঠ দানই শেষ নয়। তাকে দেখতে হবে ছাত্র–ছাত্রীরা পাঠদান বুঝতে পারছে কিনা। পড়াশুনায় মনোযোগী না অমনোযোগী, বাড়ির কাজ ঠিকমতো করছে কিনা তা দেখা এবং ভুল সংশোধন করে দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলো শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। শিক্ষকের ন্যায় ছাত্র–ছাত্রীদেরও কিছু নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে যেমন- যথাসময়ে স্কুলে যাওয়া, বাড়ির কাজ করা এবং শিক্ষকের আদেশ নির্দেশ মেনে চলা ইত্যাদি। নৈতিকতা বলতে মানুষের ভালো মন্দের বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিকটি গ্রহণ করাকে বুঝায়। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন নৈতিকতার অংশ।

ব্যবসায়ে নৈতিকতা (Business Ethics)

একটি ব্যবসায়ের ধারণা চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে এটি সফলভাবে পরিচালনার সাথে অনেক কাজ জড়িত। এসব কাজ সুন্দর, সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নৈতিকতা দিক-নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। সাথে সাথে 'ব্যবসায় নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ' ব্যবসায় জগতে আমাদের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালনা করে।

ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজে জনগণের বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা মিটানোর জন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় ও চলমান থাকে। একজন ব্যবসায়ী বা ব্যবসায় উদ্যোক্তা জনগণের চাহিদা মোতাবেক পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন বা প্রস্তুত করে উৎপাদন খরচের সাথে মুনাফা যোগ করে বা অন্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ক্রয় করে ক্রয়মূল্যের সথে মুনাফার পরিমাণ যোগ করে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করে। ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের ব্যবধানই মুনাফা। অতিরিক্ত লাভের আশায় পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে বেশি দাম ধার্য করলে তা হবে নৈতিকতার পরিপন্থী। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু নৈতিকতা রয়েছে। যেমন পণ্যের দাম এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে তার লাভ হয় কিন্তু মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। ব্যবসায়ী এমন পণ্য-দ্রব্য সরবরাহ করবে না যা জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অর্থাৎ জনগণ এবং ব্যবসায় উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করেই ব্যবসা পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। ব্যবসায়ে অন্য নৈতিকতাগুলো হলো–

- সততা বজায় রাখা
- ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন ও বিপণন না করা

- গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা না করা
- মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য-দ্রব্য বিক্রি না করা
- কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা
- বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও শিল্প আইন মেনে চলা
- পরিবেশের ক্ষতি সাধন না করা
- জনকল্যাণে অবদান রাখা

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Business Values and Ethics)

অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন বা অন্য কোনো কারণেই হোক ব্যবসায় অনৈতিক কার্যকলাপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে ব্যবসায় নৈতিকতার প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা উল্টালে ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক নেতিবাচক খবর ও চিত্র চোখে পড়ে। মরা মুরগি কেনা-বেচা, খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল, নিম্নমানের পণ্য তৈরি বা বিক্রয়, ওজনে কম, ফরমালিনযুক্ত মাছ ও ফলমূল, পণ্য দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে মিথ্যা ও অতিরিক্ত তথ্য দান, নির্মাণ কাজে নিম্নমানের দ্রব্য ব্যবহার, ঔষধে ভেজাল, চলাচলের অযোগ্য যানবাহনের রাস্তায় চলাচল ইত্যাদি ব্যবসায়ে অনৈতিক বার্যকলাপের উদাহরণ। এসব অনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ। ভেজাল ঔষধ খেয়ে অনেক শিশু মারা গেছে এবং অনেক শিশু অসুস্থ হচ্ছে। ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ নানা রকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের এসব অনৈতিক কার্যকলাপ রোধ না করা গেলে রোগাক্রান্ত মানুষদের একটি অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। যার ফল হবে ভয়াবহ। নিম্নোক্ত কারণে ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। অনৈতিক কার্যকলাপ ও অনৈতিক আচরণ মানুষের কাছ থেকে কাম্য নয়।

২। ব্যবসায়ী প্রস্তুতকৃত বা সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে জীবন ধারণ করে। তাদের নৈতিক দায়িত্ব সঠিক পণ্য দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করা।

৩। বর্তমানে ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যার প্রতিক্রিয়াও ভয়াবহ। একমাত্র ব্যবসায় নৈতিকতা বোধ এই ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করতে পারে।

৪। ঔষধপত্রে ভেজালের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেকক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। ঔষধ প্রস্তুতকারকদের নৈতিক আচরণই এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

৫। ব্যবসায় একাটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের ভালো-মন্দ, কল্যাণ দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৬। ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন হলেও সামাজিক দায়িত্ব পালনও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজে অবহেলা বা অনীহা ব্যবসায়ের জন্য মঙ্গলময় নয়।

৭। ব্যবসার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন অপরিহার্য।

৮। ব্যবসায় সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকা অপরিসীম। নৈতিকতার সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করলে ব্যবসায় সিদ্ধান্তসমূহ সঠিক হবে।

৯। ব্যবসায়ে অনৈতিক কার্যাবলির মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হলেও এর পরিণাম কখনও ভালো হয় না। অনেক ব্যবসায় প্রথমে ভালো ফলাফল করেও অনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

১০। অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যবসায়ীকে সবাই ঘৃণা করে। সমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে হলে ব্যবসায় নৈতিক আচরণ বা সত্য পথ অবলম্বনের বিকল্প নেই।

ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ও গুরুত্ব (Concept of Social Responsibility and Its Importance)

ব্যবসার সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে মুনাফা অর্জনের সাথে সমাজের কিছু মঙ্গলময় বা কল্যাণমূলক কাজ করাকে বুঝায়। প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জনকে ঘিরেই পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন এসেছে। ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজকে ঘিরেই এর কার্যক্রম। সমাজে বসবাসকারী জনগণের বিভিন্ন ধরনের ভোগ্য পণ্য এবং অন্যান্য পণ্য বা সেবার চাহিদা নিরূপণ করে তা প্রস্তুত বা সংগ্রহ করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া ব্যবসার প্রধান কাজগুলোর অন্যতম। তবে সুন্দর জীবন যাপনের জন্য আরও কিছু চাহিদা থাকে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন প্রভৃতি। ব্যয়বহুল বিধায় জনগণের নাগালের বাইরে এসব কাজ সাধারণত সরকারের দায়িত্ব বলে গণ্য করা হয়। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জনহিতকর কাজ যেমন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, স্কুল স্থাপন, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কাজে এগিয়ে এসেছে। ব্যবসা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সমর্থনের উপর এর স্থায়িত্ব ও মুনাফা নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি নৈতিক দায়িত্ব।

প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যবসায়ী সমাজের একজন সৃজনশীল এবং সচেতন নাগরিক। যে কোনো ব্যবসায়ী একজন সৃজনশীল, চিন্তাশীল এবং কর্মক্ষম ব্যক্তি। সমাজের কাছে থেকে যেমন তার কিছু পাওয়ার রয়েছে তেমনি তারও সমাজকে কিছু দেওয়ার রয়েছে। তার অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ জনহিতকর কাজে ব্যয় করলে সমাজ যেমন উপকৃত হবে তেমনি তার সম্মানও বাড়বে ।

কর্মপত্র ১ (দলীয় কাজ) : ব্যবসায়ীদের কী কী কারণে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা উচিত বলে তুমি মনে কর।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

কেস স্টাডি

আবুল কাশেম একজন বুদ্ধিমান, সাহসী, বিশ্বস্ত এবং সৎ যুবক। পাড়ার যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা থাকে। স্কুলে পড়াশুনা করার মাঝে মাঝে একটি ফার্মেসিতে যাতায়াত করত। কোনো কোনো সময় ফার্মেসির মালিককে কাজে সাহায্য করত। এতে সে ফার্মেসি ব্যবসায় সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এসএসসি পাস করার পর আর পড়াশুনা করতে না পেরে তার মায়ের কিছু অলংকার বিক্রয় করে পুঁজি সংগ্রহ করে একটি ছোট ফার্মেসি স্থাপন করে। ছোট বেলায় বাবার কাছ থেকে শুনে ছিলেন মানুষকে ঠকাবে না, কেউ পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ

দেবে এবং কখনো মিথ্যা বলবে না, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করবে, অসহায়কে সাহায্য করবে। আবুল কাশেম ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতা অনুসরণ করতেন। কোনো ব্যক্তি ঠিকানা সম্পর্কে পরামর্শ চাইলে কোনো ভাল ডাক্তারের নাম বলে দিতেন, সৎ পরামর্শ দিতেন। অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী তার পরামর্শে ভালো ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়ে উপকৃত হয়েছে। এছাড়াও তিনি সর্বদা খাঁটি ঔষধ বিক্রয় করতেন। অতি লাভের জন্য বেশি দামে বা নকল ঔষধ বিক্রয় করতেন না। এসব কারণে অচিরেই তার মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে তিনি একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। পাশাপাশি তার ব্যবসায় সমৃদ্ধিও লাভ করে।

এক সময় তার ছেলে আব্দুর রহমান ফার্মেসির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সে অতি লোভের আশায় নকল ঔষধ বিক্রয় শুরু করে। তার দোকান থেকে ঔষধ কিনে অনেকের স্বাস্থ্যহানি হয়েছে। নকল ঔষধ বিক্রয় করায় অল্প সময়ের ভিতর সে অসৎ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ধীরে ধীরে ব্যবসায়ের সুনামহানি ঘটে ও ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটে।

কর্মপত্র ২ (দলীয় কাজ) : আবুল কাশেম ও আব্দুর রহমানের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ধরন বিবেচনা করে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর
• • • • • • •

বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে ব্যবসায়ীকে নিজের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য অর্জনের পাশাপাশি অনেক পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। এরা হলো রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা ও কর্মচারী। এসব পক্ষ কোনো না কোনো ভাবে ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা (Responsibility to State)

জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে ব্যবসা পরিচালিত হোক এটাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ব্যবসায় স্থাপন ও অগ্রগতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের চাহিদা মেটানো হলে অর্থাৎ পণ্য বা সেবা প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিত কর প্রদান করা হলে সরকার খুশি। ব্যবসায়কে রাষ্ট্রের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়–

ক. সরকারকে নিয়মিত কর ও রাজস্ব প্রদান করা।

খ. সরকারের নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করা।

গ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা (Responsibility to Society)

সমাজ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেই ব্যবসায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। তবে ব্যবসায়কে সমাজের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

ক. সমাজের প্রয়োজন মাফিক মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা।

খ. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ. বিভিন্ন জনহিতকর কাজে সহায়তা করা।

ঘ. জাতীয় দুর্যোগে জনগণের পাশে দাঁড়ানো।

ঙ. পরিবেশ দূষণ থেকে এলাকাকে রক্ষা করা।

চ. পণ্যের মজুতদারি না করা।

ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা (Responsibility to Customer and Consumer)

ক্রেতা ও ভোক্তাদের আস্থা ও সহযোগিতার উপর ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে। তাই ব্যবসায়ীকে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

ক. পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা।

খ. মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা।

গ. পণ্য সামগ্রী প্রাপ্তি সহজতর করা।

ঘ. পণ্য ও বাজারসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা।

শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা (Responsibility to Employees)

শ্রমিক ও কর্মচারীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জিত হয়। তাই তাদের স্বার্থকে অবহেলা করে ব্যবসা পরিচালনা করা যায় না। ব্যবসায় উন্নতির সাথে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও বোনাস প্রদান করা এবং তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। একজন ব্যবসায়ীকে তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

ক. উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও আর্থিক সুবিধা দান।

খ. চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা।

গ. কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ. প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।

ঙ. বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম (Social Activities by Different Business Organizations)

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বহুযুগ ধরে অবহেলিত হয়ে আসলেও বর্তমানে দেশে বিদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান সামাজিক কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল কোম্পানি তাদের সাধারণ ব্যবসায় কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ও বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানি যেমন- টেলিটক, গ্রামীণ ফোন, রবি, বাংলা লিংক, সিটিসেল, এয়ারটেল প্রভৃতি দারিদ্র্য বিমোচন, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের

পড়াশুনার খরচ বহন, বৃত্তি প্রদান ও খেলাধুলার উন্নয়নে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। কিছু কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তরুণ সমাজের প্রতিভা অনুসন্ধান ও বিকাশে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রবণতা বেশি দিনের নয়। আশা করা যায়, আমাদের শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি মুনাফামুখী ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক দায়িত্ব পালনে আরো এগিয়ে আসবে।

পরিবেশ দূষণ ও ব্যবসায় (Environmental Pollution and Business)

শিল্প কারখনার বর্জ্য থেকে নদী দূষণ

ব্যবসা বিশেষ করে শিল্পোন্নয়নের সবচেয়ে বড় সমস্যা পরিবেশ দূষণ। শিল্প বর্জ্য নির্গত তরল পদার্থ নদী-নালায় পড়ে পানি দূষিত করছে। বিষাক্ত পানি মাছসহ জলজ প্রাণী বাস করার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যত্রতত্র ময়লা নিক্ষেপ ও যান বাহনের ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে। কারখানার মেশিন ও জেনারেটরের বিকট আওয়াজে ভয়াবহ শব্দ দূষণ হচ্ছে। এছাড়া শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার নামে অবাধে গাছ নিধন ও পাহাড় কেটে পরিবেশকে দূষণ করা হচ্ছে। আবাসনের নামে চাষের জমি হরণ, খাল বিল ভরাট করে আবাসন তৈরি, নদীভাঙ্গান, নির্বিচারে অনুপযুক্ত যানবাহন রাস্তায় চালানো ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। এতে মানুষের স্বাস্থ্যহানি তো হচ্ছেই তদুপরি জীব বৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে ।

দূষণের প্রভাবমুক্ত হতে সরকার আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু আইনের প্রয়োগ যথার্থভাবে হচ্ছে না বলে পরিবেশ দূষণ বেড়েই চলছে। পরিবেশ দূষণের অন্য কারণগুলোর মধ্যে জনগণের অসচেতনতা, যেখানে সেখানে ময়লা নিক্ষেপ ও ত্রুটিপুর্ণ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও দায়ী।

পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পেতে হলে গণমাধ্যমের সাহায্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের যথার্থ প্রয়োগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ এবং পাঠ্যসূচিতে পরিবেশ দূষণ কোর্স অন্তর্ভুক্তি একান্ত আবশ্যক।

কর্মপত্র–৩ (দলীয় কাজ) : ব্যবসায়ের মাধ্যমে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও ভূমি দূষণের কারণ ও পরিবেশের উপর প্রভাব	
বায়ু দূষণের কারণ • • •	পরিবেশের উপর প্রভাব • • •
পানি দূষণের কারণ • • •	পরিবেশের উপর প্রভাব • • •
শব্দ দূষণের কারণ • • •	পরিবেশের উপর প্রভাব • • •
ভূমি দূষণের কারণ • • •	পরিবেশের উপর প্রভাব • • •

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। **ব্যবসায় কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?**

ক. অর্থনৈতিক **খ. সামাজিক**

গ. রাজনৈতিক **ঘ. পারিবারিক**

২। **ব্যবসায়ীকে দীর্ঘদিন ব্যবসায়ে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন–**

i. **অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন**

ii. **পণ্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ**

iii. **মানসম্মত পণ্য সরবরাহ**

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii **খ.** i ও iii

গ. ii ও iii **ঘ.** i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব ফাহিম কিশোরগঞ্জের জনবহুল এলাকা আগরপুরে "তাসনিম হাইড এন্ড স্কিন" নামে একটি চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। এ কারখানায় বর্জ্য নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় সেগুলি জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। তবে কারখানার নিকটেই তিনি শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করেন এবং নিয়মিত কর প্রদান করেন।

৩। নিয়মিত কর প্রদানের মাধ্যমে ফাহিম কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন?

ক. সমাজ খ. রাষ্ট্র
গ. ক্রেতা ঘ. শ্রমিক

৪। 'তাসনিম হাইড এন্ড স্কিন' শিল্পটি স্থাপনের ফলে-

i. দেশের জনগণের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে
ii. এলাকার কৃষি জমির উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে
iii. এলাকার জলজ প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সাহিদ স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসায় করে সীমিত মুনাফা করেন। অপরদিকে তার বন্ধু নাদিম চাকচিক্যের আড়ালে ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্য বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। পণ্যের বাহ্যিক চাকচিক্যের কারণে ক্রেতারা নাদিমের দোকানে ভিড় করে। সাহিদ নাদিমের চেয়ে কম অর্থ উপার্জন করলেও মানসিকভাবে অনেক সুখী।

ক. 'ইথস' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'পণ্যের মজুতদারি না করা' কোন ধরনের দায়বদ্ধতা? ব্যাখ্যা কর।
গ. সাহিদের মানসিক প্রশান্তির কারণটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. নাদিম বর্তমানে প্রচুর মুনাফা করলেও ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে টিকে থাকবে কি? এ ব্যাপারে তোমার মতামত দাও।

২। জনাব আলী গাজীপুরের গজারি বন এলাকায় গাছপালা কেটে ৫০০ একর জমির উপর 'নাঈম ফার্মা' নামে ঔষধ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তীতে পরিবেশবাদী বন্ধুর পরামর্শে পার্শ্ববর্তী খালি জায়গায় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত ঔষধ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন পদে ২০০০ লোক কর্মরত রয়েছে।

ক. কল-কারখানায় নির্গত কালো ধোঁয়া পরিবেশের কী দূষণ করে?
খ. ব্যবসায়ের নৈতিকতা বলতে কী বুঝায়-ব্যাখ্যা কর।
গ. "নাঈম ফার্মা" প্রতিষ্ঠানটি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কীভাবে সহায়তা করছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কারখানা স্থাপনের জন্য জনাব আলীর প্রথম সিদ্ধান্তটি মূল্যায়ন কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

সফল উদ্যোক্তাদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয়

Leassons Learned from the Lives of Successful Entrepreneurs

স্মরণাতীতকাল থেকে আমাদের দেশ শিল্প বাণিজ্যে ঐতিহ্য ও গৌরব বহন করলেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিল্পের অবদান তেমন উজ্জ্বল নয়। স্বাধীনতার আগে মাত্র অল্প কয়েকজন বাঙালি ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করেন। মূলত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালিরা ব্যবসায়ের সুযোগ পান। বিগত ৪০ বছরে বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা ছোট ব্যবসায় দিয়ে শুরু করে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত হন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এ অধ্যায়ে দেশের দুইজন স্বনামধন্য শিল্প উদ্যোক্তা জনাব জহুরুল ইসলাম ও জনাব স্যামসন এইচ চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তার জীবনী আলোচনা করা হলো যাদের জীবন ও কর্ম থেকে আমরা সকলেই অনুপ্রাণিত হতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- জহুরুল ইসলাম ও স্যামসন এইচ চৌধুরীর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বলতে পারব।
- জহুরুল ইসলাম ও স্যামসন এইচ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সংগঠনগুলোর বর্ণনা করতে পারব।
- জহুরুল ইসলাম ও স্যামসন এইচ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম বলতে পারব।
- জহুরুল ইসলাম ও স্যামসন এইচ চৌধুরীর উদ্যোক্তা হওয়ার কাহিনী বলতে পারব।
- উদ্যোক্তাগণের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় দিকগুলো শনাক্ত করতে পারব।
- স্থানীয় পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তাদের সফলতা প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব।

জহুরুল ইসলাম(১৯২৮–১৯৯৫)

বাংলাদেশের অন্যতম সফল উদ্যোক্তা হচ্ছেন জনাব জহুরুল ইসলাম। ব্যবসায় প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম, দুরদর্শিতা ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে গঠিত এ মানুষটি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের ব্যবসায়-শিল্প-বাণিজ্য জগতে একটি অতি পরিচিত নাম। তিনি ১৯২৮ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আলহাজ্ব আফতাব উদ্দিন ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের একজন সাধারণ কন্ট্রাক্টর। তার মাতার নাম বেগম রহিমা আক্তার খাতুন। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে জহুরুল ইসলাম ছিলেন দ্বিতীয়। তার চাচা ছিলেন কলকাতার পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের একজন ওভারশিয়ার। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়া শেষ করে তিনি কিছুদিন সরারচর শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। এরপর ভর্তি হন বাজিতপুর হাইস্কুলে। কিছুদিন পর তিনি চাচা মুর্শেদ উদ্দীনের সঙ্গে চলে যান কলকাতায়। ১৯৪৫ সালে তিনি কলকাতার রিপন হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৮ সালে মুন্সীগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। প্রতিকূল পরিবেশ ও পারিবারিক দায়-দায়িত্বের চাপে তার আনুষ্ঠানিক পড়াশুনার সমাপ্তি ঘটে। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ১৯৪৮ সালে সি এন্ড বি ডিপার্টমেন্টের ওয়ার্ক সরকার পদে মাত্র সাতাত্তর টাকা বেতনের চাকরি নেন। তিনি কিছুদিন পর ঐ বিভাগে নিম্নমান সহকারী বা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদ লাভ করেন। চাচার চাকরি ও পিতার কন্ট্রাকটরি ব্যবসার প্রভাব তার জীবনের উপর পড়েছিল। আড়াই বছর পর ১৯৫১ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন এবং একজন তৃতীয় শ্রেণির কন্ট্রাক্টর হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে তিন-চার হাজার টাকার মতো সামান্য পুঁজি নিয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায় শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম ও ব্যবসায়ের প্রতি একাগ্রতা ও আন্তরিকতা তাকে ধীরে ধীরে একজন সার্থক ব্যবসায় উদ্যোক্তা ও অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিণত করেন। ঠিকাদারি জীবনের শুরুতেই তিনি কিশোরগঞ্জ পোস্ট অফিস নির্মাণের কাজ করেন। পরে ঢাকার গুলিস্তান থেকে টিকাটুলী সড়কের কাজ। কাজের সততা ও গুণগত মানের কারণে দুই বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে তিনি পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণির কন্ট্রাক্টর বা ঠিকাদার হিসেবে পরিণত হন। সব ধরনের নির্মাণ কাজে আগ্রহ ছিল। বাড়ি, রাস্তা, ব্রিজ, সেচ ব্যবস্থা, স্যানিটেশন সব কিছুতেই তিনি বিনিয়োগ করেছিলেন। কাজের মাধ্যমে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন তা পরবর্তী কাজে ব্যবহার করতেন। তিনি দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পারলেন ঢাকার আশেপাশে এক সময় বসতি বাড়বে এবং একই সঙ্গে বাড়বে জমির চাহিদা। তাই তিনি ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে এবং মিরপুর, সাভার, জয়দেবপুর, কালিয়কৈর অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ জমি ক্রয় করেন। সে জমিগুলোতে তিনি শিল্প স্থাপন ও আবাসিক গৃহ নির্মাণের কাজে লাগান। দিনে দিনে জমির দাম বাড়ার কারণে জহুরুল ইসলামের বিনিয়োগকৃত মূলধনের মূল্যও বাড়তে থাকে। তিনি ১৯৬০ সালের দিকে চট্টগ্রামে একটি টিম্বার কারখানা ও

ঢাকার জিঞ্জিরায় একটি গ্লাস কারখানা স্থাপন করেন। ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের আবাসন চাহিদা মেটাতে ১৯৬৪ সালে ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড নামে একটি সহ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যা বর্তমানে বাংলাদেশের আবাসন খাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠিত সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইসলাম গ্রুপ অব কোম্পানিজ নামে পরিচিত যা ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আওতায় রয়েছে ইস্টার্ন হাউজিং লিঃ, নাভানা লিঃ, মিলনার্স লিঃ, এসেনশিয়াল প্রোডাক্ট লিঃ, ঢাকা ফাইবার্স লিঃ, ক্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, নাভানা স্পোর্টস লিঃ, ঢাকা রি-রোলিং মিলস্ লিঃ, আফতাব অটোমোবাইলস লিঃ, আফতাব ডেইরী ইত্যাদি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ নিয়োজিত আছে।

পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাস তাঁকে সফল মানুষে পরিণত করেছিল। এই অসাধারণ বাঙালি কৃতী সন্তান শুধু শিল্পপতি পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকেননি। একজন সমাজ সংস্কারক, সফল সংগঠক, ব্যবস্থাপকের মডেল তিনি। তার সব অর্জনই সম্ভব হয়েছে কঠোর শ্রম ও আন্তরিকতায়। শুধু বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানেই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তার জনহিতকর হাত প্রসারিত হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, ব্যাংকিং, কৃষি, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তিনি বহু অনাথ আশ্রম, শিশু প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্যোগে বাজিতপুরে স্থাপিত ৩৫০ শয্যার জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটি বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত দেশের সর্ববৃহৎ মেডিকেল কলেজ। তাছাড়া নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও জহুরুল ইসলাম এডুকেশন কমপ্লেক্স তার অন্যতম কীর্তি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও তিনি নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৯৫ সালের ১৯ অক্টোবর এই কর্মবীরের জীবনাবসান হয়।

জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ

কর্মপত্র-১ঃ সফল ব্যবসায় উদ্যোক্তা জনাব জহুরুল ইসলামের জীবনের যে দিকগুলো তোমাকে আকৃষ্ট করেছে তা চিহ্নিত কর এবং তোমার মধ্যে সে গুণগুলো কীভাবে চর্চা করবে তা ব্যক্ত কর

সফল উদ্যোক্তা জনাব জহুরুল ইসলামের বিশেষ গুণাবলি	নিজ জীবনে চর্চা করার উপায়
•	•
•	•
•	•

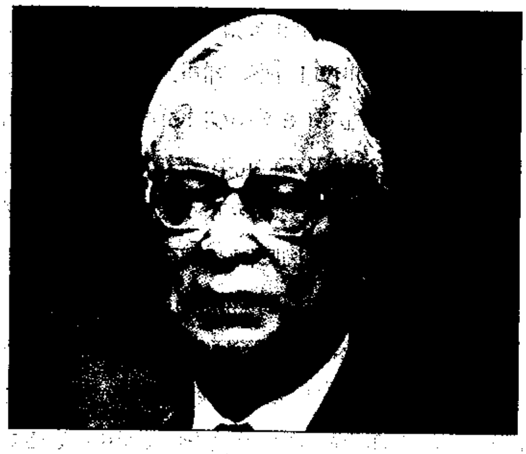

স্যামসন এইচ চৌধুরী (১৯৩০–২০১২)

বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় নাম স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান, জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব স্যামসন এইচ চৌধুরী। তার জন্ম ১৯২৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলায়। পিতা ই এইচ চৌধুরী ও মাতা লতিকা চৌধুরী। স্যামসন চৌধুরীর পিতা ছিলেন আউটডোর ডিসপেনসারির মেডিকেল অফিসার। তিনি ১৯৩০–৪০ সাল পর্যন্ত কলকাতার বিষ্ণুপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। সেখান থেকে তিনি সিনিয়র কেমব্রিজ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি হাভার্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ফিরে আসেন পাবনার আতাইকুলা গ্রামে। পিতার পেশার কারণে ছোটবেলা থেকেই তিনি ঔষধ নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি ফার্মেসি বা ঔষধের দোকানকেই ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেন। গ্রামের বাজারে দিলেন একটি ছোট দোকান। সময়টি ১৯৫২ সাল। ১৯৫৮ সালে তিনি ঔষধ কারখানা স্থাপনের একটি লাইসেন্স পান। তিনিসহ আরো তিন বন্ধু মিলে প্রত্যেকের ২০,০০০ টাকা করে মোট ৮০,০০০ টাকায় ১২ জন শ্রমিক নিয়ে স্থাপন করেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। এ কারখানায় প্রথম যে ঔষধটি তৈরি হয় তা ছিল রক্ত পরিশোধনের 'এস্টন সিরাপ'। দেশীয় আমদানিকারকদের কাছ থেকে চড়া দামে কাঁচামাল কিনে তৈরি করতে হতো এ ঔষধ। গুণগতমানের সাথে আপোস করা হয়নি কখনো। গুণগতমানের কারণেই প্রেসক্রিপশনে এ ঔষধের নাম উল্লেখ করতেন স্থানীয় ডাক্তারগণ। এক পর্যায়ে নামকরা কোম্পানির ঔষধের চেয়েও বেশি চলতে থাকে স্কয়ারের এ ঔষধ। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন স্কয়ার একদিন অনেক বড় হবে। এ স্বপ্ন বুকে নিয়ে অফুরন্ত উদ্যম ও সাহসকে পুঁজি করে সামনের সব প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে ধীরে ধীরে এগিয়েছেন তিনি। কঠোর পরিশ্রম, সততা ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সেই ছোট উদ্যোগ আজ বিশাল স্কয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সেখানে প্রায় ৩০,০০০ শ্রমিক কর্মরত। শুধু ঔষধ শিল্প নয়, এ শিল্প গ্রুপের ব্যবসায় সম্প্রসারিত হয়েছে প্রসাধন সামগ্রী, টেক্সটাইল, কৃষিপণ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা ও মিডিয়ায়। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে স্কয়ারের পণ্য। ঔষধের গুণগতমান দেশে বিদেশে স্বীকৃত। পৃথিবীর ৫০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে স্কয়ারের ঔষধ। দেশের অন্যতম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙা টেলিভিশনের তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। তাছাড়া তিনি মেট্রোপলিটন চেম্বার ও ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি ছিলেন। যুক্ত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার এন্ড কমার্স বাংলাদেশের সাথে। স্যামসন এইচ চৌধুরী সম্পর্কে শোভা অধিকারী লিখেছেন, 'একাধারে তিনি ছিলেন মালিক-ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক, টাইপিস্ট, কেরানি, শ্রমিক ও মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। উপর থেকে নিজ পর্যন্ত এমন কোনো কাজ নেই যা তাকে করতে হয়নি। এ দেশের প্রায় সবকটি শহর, বন্দর ও গঞ্জে স্কয়ারের তৈরি ঔষধ বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে ঘুরেছেন। বন্ধু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্কয়ার এখন বাংলাদেশের একটি গর্বিত নাম। ২০০৯–২০১০ অর্থবছরে স্কয়ার গ্রুপ বছরের সেরা করদাতা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিল।

স্যামসন এইচ চৌধুরী (১৯৩০-২০১২)

বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় নাম স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান, জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব স্যামসন এইচ চৌধুরী। তার জন্ম ১৯২৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলায়। পিতা ই এইচ চৌধুরী ও মাতা লতিকা চৌধুরী। স্যামসন চৌধুরীর পিতা ছিলেন আউটডোর ডিসপেনসারির মেডিকেল অফিসার। তিনি ১৯৩০-৪০ সাল পর্যন্ত কলকাতার বিষ্ণুপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। সেখান থেকে তিনি সিনিয়র কেমব্রিজ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি হাভার্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ফিরে আসেন পাবনার আতাইকুলা গ্রামে। পিতার পেশার কারণে ছোটবেলা থেকেই তিনি ঔষধ নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি ফার্মেসি বা ঔষধের দোকানকেই ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেন। গ্রামের বাজারে দিলেন একটি ছোট দোকান। সময়টি ১৯৫২ সাল। ১৯৫৮ সালে তিনি ঔষধ কারখানা স্থাপনের একটি লাইসেন্স পান। তিনিসহ আরো তিন বন্ধু মিলে প্রত্যেকের ২০,০০০ টাকা করে মোট ৮০,০০০ টাকায় ১২ জন শ্রমিক নিয়ে স্থাপন করেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। এ কারখানায় প্রথম যে ঔষধটি তৈরি হয় তা ছিল রক্ত পরিশোধনের 'এস্টন সিরাপ'। দেশীয় আমদানিকারকদের কাছ থেকে চড়া দামে কাঁচামাল কিনে তৈরি করতে হতো এ ঔষধ। গুণগতমানের সাথে আপোস করা হয়নি কখনো। গুণগতমানের কারণেই প্রেসক্রিপশনে এ ঔষধের নাম উল্লেখ করতেন স্থানীয় ডাক্তারগণ। এক পর্যায়ে নামকরা কোম্পানির ঔষধের চেয়েও বেশি চলতে থাকে স্কয়ারের এ ঔষধ। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন স্কয়ার একদিন অনেক বড় হবে। এ স্বপ্ন বুকে নিয়ে অফুরন্ত উদ্যম ও সাহসকে পুঁজি করে সামনের সব প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে ধীরে ধীরে এগিয়েছেন তিনি। কঠোর পরিশ্রম, সততা ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সেই ছোট উদ্যোগ আজ বিশাল স্কয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সেখানে প্রায় ৩০,০০০ শ্রমিক কর্মরত। শুধু ঔষধ শিল্প নয়, এ শিল্প গ্রুপের ব্যবসায় সম্প্রসারিত হয়েছে প্রসাধন সামগ্রী, টেক্সটাইল, কৃষিপণ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা ও মিডিয়ায়। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে স্কয়ারের পণ্য। ঔষধের গুণগতমান দেশে বিদেশে স্বীকৃত। পৃথিবীর ৫০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে স্কয়ারের ঔষধ। দেশের অন্যতম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙা টেলিভিশনের তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। তাছাড়া তিনি মেট্রোপলিটন চেম্বার ও ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি ছিলেন। যুক্ত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার এন্ড কমার্স বাংলাদেশের সাথে। স্যামসন এইচ চৌধুরী সম্পর্কে শোভা অধিকারী লিখেছেন, 'একাধারে তিনি ছিলেন মালিক-ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক, টাইপিস্ট, কেরানি, শ্রমিক ও মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এমন কোনো কাজ নেই যা তাকে করতে হয়নি। এ দেশের প্রায় সবকটি শহর, বন্দর ও গঞ্জে স্কয়ারের তৈরি ঔষধ বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে ঘুরেছেন। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্কয়ার এখন বাংলাদেশের একটি গর্বিত নাম। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে স্কয়ার গ্রুপ বছরের সেরা করদাতা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিল।

স্কয়ারের তৈরি হরেক রকমের পণ্য আজ মানুষের ঘরে-ঘরে। মান, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, গুণগতমান ও কাজের শৃঙ্খলার কারণে দেশে-বিদেশে স্কয়ার পণ্য সমাদৃত। শিল্প সৃষ্টির নেশা স্যামসন চৌধুরীকে পৌছে দিয়েছে সফল শিল্পপতি ও সার্থক উদ্যোক্তার কাতারে। নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্যমে তিনি একের পর এক গড়ে তুলেছেন নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে স্কয়ার গ্রুপের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, স্কয়ার টয়লেট্রিজ, স্কয়ার টেক্সটাইলস, স্কয়ার হোল্ডিংস, স্কয়ার স্পিনিংস, স্কয়ার কনজিউমার প্রোডাক্টস, স্কয়ার নিট ফেব্রিকস, স্কয়ার ফ্যাশনস, স্কয়ার হারবাল এন্ড ন্যাচারেলস, স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেড। বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাতকারে এ শিল্পোদ্যোক্তা তার সাফল্যের ভিত্তি হিসেবে ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সততাকেই মূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি স্তরে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চর্চাই স্কয়ারকে মানুষের আস্থার আসনে বসিয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সর্বদাই আশাবাদী এ উদ্যোক্তা মালিক ও শ্রমিকের যৌথ প্রয়াসকেই ব্যবসায় সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে মনে করতেন। শ্রমিকবান্ধব এ শিল্পপতির কারখানায় কখনো শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যায়নি। ২০১২ সালের ৫ জানুয়ারি ৮৬ বয়সে এ কীর্তিমানের জীবনাবসান হয়। তার স্ত্রীর নাম অনিকা চৌধুরী। তার তিন ছেলে তপন চৌধুরী, অঞ্জন চৌধুরী, স্বপন চৌধুরী ব্যবসায়ী হিসেবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

পাবনার বিখ্যাত অন্নদা গোবিন্দ লাইব্রেরির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্যামসন এইচ চৌধুরী

পুরস্কার ও স্বীকৃতি

দেশের বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য ২০১০ সালে সরকার ৪২ জন ব্যক্তিকে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (Commercially Important Prerson-CIP) নির্বাচন করে। তন্মধ্যে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর ১৮ জনের মধ্যে একজন ছিলেন স্যামসন এইচ চৌধুরী। তিনি ২০০০ সালে দৈনিক ডেইলি স্টার ও ডি এইচ এল প্রদত্ত বিজনেসম্যান অব দি ইয়ার এবং ১৯৯৮ সালে অ্যামেরিকান চেম্বার অব কমার্সের দৃষ্টিতে 'বিজনেস এক্সিকিউটিভ অব দি ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কর্মপত্র–২ : সফল ব্যবসায় উদ্যোক্তা জনাব স্যামসন এইচ চৌধুরীর জীবনের যে দিকগুলো তোমাকে আকৃষ্ট করেছে তা চিহ্নিত কর এবং তোমার মধ্যে সে গুণগুলো কীভাবে চর্চা করবে তা ব্যক্ত কর	
সফল উদ্যোক্তা স্যামসন এইচ চৌধুরীর বিশেষ গুণাবলি	নিজ জীবনে চর্চা করার উপায়
• • • • •	• • • • •

শাহিদা বেগম গৃহবধূ থেকে উদ্যোক্তা

বরিশালের লিবার্টি জেন্টস টেইলার্সের স্বত্বাধিকারী শাহিদা বেগম। শখ বা পরিকল্পনা করে নয়, নিতান্ত প্রয়োজনে তিনি ব্যবসায় শুরু করেন। কখনও ভাবেননি এরকম কিছু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। যখন শুরু করলেন তখন নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে পড়েছিলেন। কিন্তু দৃঢ় মনোবল ও পরিশ্রমই তাকে এনে দিয়েছে সাফল্য ও সম্মান। পুরুষদের পোশাক তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন এবং এখনো করছেন। শাহিদা বেগম বাস করেন বরিশাল শহরে। স্বামীর টেইলারিং ব্যবসায় আর চার মেয়ে নিয়ে তার দিনগুলো ভালোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই তার স্বামী অসুস্থ হন। ১৯৯৭ সালে তার স্বামী তাদের সবাইকে রেখে চলে যান পরপারে। শাহিদা যেন চোখে অন্ধকার দেখেন। কীভাবে চলবে সামনের দিনগুলো? মেয়েদের ভবিষ্যত কী হবে? ঘর সংসারের কাজ ছাড়া তিনি কিছুই জানতেন না। ব্যবসায়ও বোঝেন না। বরিশাল সদর হাসপাতালের কাছে তার স্বামীর জেন্টস টেইলার্সটির অবস্থাও তখন ভালো ছিল না। স্বামী অনেকদিন অসুস্থ থাকায় সমস্ত সঞ্চয়ও শেষ হয়েছিল। শাহিদার সামান্য গহনাই সম্বল ছিল। গহনা বিক্রি করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েই ব্যবসায়টি শুরু করেন। দোকানের কর্মচারীও তখন ছিল ২ জন। তাদের কাছে টেইলারিং শেখেন। শুরু করেন কাজ।

শুরুতে পুরুষ ক্রেতা, পরিবারের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন কেউ এ কাজটিকে ভালোভাবে নেননি। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দেননি। আত্মবিশ্বাস ও কঠিন মনোবল নিয়ে তিনি পুরো পরিস্থিতি সামলে নিয়ে একটি আধুনিক জেন্টস টেইলার্স গড়ে তোলেন। এভাবেই তিনি সাধারণ গৃহবধূ থেকে পুরোপুরি ব্যবসায়ী হয়ে উঠেন। তিনি ২০০৮ সালে সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে পুরস্কার পেয়েছেন।

আজাদ প্রোডাক্টসের মালিক আবুল কালাম আজাদ

জীবনের প্রথম ব্যবসায় শুরু করেছিলেন মাত্র ৪৫০ টাকা পুঁজি নিয়ে। ধীরে ধীরে সে ব্যবসায় পরিণত হয়েছে বিশাল প্রতিষ্ঠানে। আজকে তিনি দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আজাদ প্রোডাক্টসের কর্ণধার। নাম আবুল কালাম আজাদ। ১৯৭০ সালের কথা। এসএসসি পরীক্ষার পর বাবার সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলেন পাটের বিনিময়ে ইলিশ মাছ ও কাঁঠাল কিনতে। সেখানে নারিকেল বিক্রি করে লাভবান হবার সুযোগ দেখে খালাত ভাইয়ের সহায়তায় মাত্র ৪৫০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন। এটিই ছিল তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। ছোট নৌকা করে এক হাট থেকে অন্য হাটে নারিকেল আনা নেওয়া করতেন। একসময় আরো কিছু করার আশায় গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি জমালেন। শুরু হলো কষ্টের জীবন। সারাদিন পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন এবং স্বপ্ন দেখতেন। এক সময় একটি উপায়ও পেলেন। বায়তুল মোকাররমের সামনে পোস্টার বিক্রি করতে দেখে নিজেও সে রকম একটি পরিকল্পনা করলেন। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করে শুরু করে দিলেন ছোট পরিসরের ব্যবসায় 'আজাদ পোস্টার হাউস'। এল রহমান জুয়েলার্সের সামনে একটি খাম্বার সাথে ঝুলিয়ে বিক্রি করতেন পোস্টার। ব্যাপারটা নিয়ে অনেকে উপহাস করতেন, আবার অনেকে উৎসাহও দিতেন। অনেক পরিশ্রম করে দেশের টিভি-সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের পোস্টার ও ভিউকার্ড তৈরি করে বাজারে ছাড়লেন। দেশের নামকরা তারকাদের ঝকঝকে পোস্টারগুলো দেশের সাধারণ মানুষ ভালোভাবেই গ্রহণ করল। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সেদিনের সেই ভ্রাম্যমাণ দোকান পরিণত হলো বিশাল আজাদ প্রোডাক্টসে। আবুল কালাম আজাদের মতে, তার সাফল্যের পেছনে আছে কঠোর পরিশ্রম ও মায়ের দোয়া। তাই নিজের মা সহ পৃথিবীর সকল মায়েদের শ্রদ্ধা জানাতে ২০০৩ সাল থেকে প্রচলন করেছেন 'রত্নগর্ভা মা অ্যাওয়ার্ড'। প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাকে দেওয়া হয় এ স্বীকৃতি ও পুরস্কার। যে মায়েদের কমপক্ষে তিনজন সন্তান বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ও প্রতিষ্ঠিত তাদেরকে রত্নগর্ভা মা আখ্যায়িত করে এ পুরস্কার। মায়েদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোও এ পুরস্কারের অন্যতম লক্ষ্য। প্রতি বছর বিশ্ব মা দিবসে এ পুরস্কারের আয়োজন করা হয়।

লুৎফা সানজিদা : সংগ্রামময় জীবনে সফল উদ্যোক্তা

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের হালিশহরের অনিন্দ্য বুটিক এবং পার্লারের মালিক লুৎফা সানজিদা যিনি মাত্র ১৫ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসায় শুরু করে আজ কোটিপতির তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন বুটিক ও পার্লার। সংগ্রামই তার জীবনের মূলমন্ত্র। অবিরাম চেষ্টা না থাকলে আজকের অবস্থায় আসা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। যখনই কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে তখনই ধৈর্য ও পরিশ্রম দিয়ে তা অতিক্রম করেছে। ১৯৮৮ সালে যখন তার এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার সময়, সংসারের প্রয়োজনে তাকে পার্টটাইম চাকরি করতে হয়েছিল। লুৎফা শিশুদের পোশাক ও পাঞ্জাবি তৈরি করে স্থানীয় বাজারের দোকানে সরবরাহ করতেন। এক কাজিনের নিকট থেকে ৩০ হাজার টাকা ধার নিয়ে ১৯৮৯ সালে তিনি চকভিউ মার্কেটে একটি শোরুম দিয়েছিলেন। সেটিই ছিল তার জীবনের ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। শুরু থেকেই দোকানটিতে বেচাকেনা ভালো হতো। ১৯৯৫ সালে তিনি চট্টগ্রামের মাইডাস থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্সে আরেকটি শোরুম দেন। ব্যবসা জমে উঠে। পরিবারে সচ্ছলতা আসতে থাকে। ২০০৪ সালে তিনি একটি বিউটি পার্লার দেন। তার প্রতিষ্ঠান অনিন্দ্য এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের শ্রম এবং ক্রেতার স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণাই তাকে সাহস জুগিয়েছে সবসময়।

তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। প্রতিবন্ধী নারী, স্বামী পরিত্যক্তা ও নির্যাতিতা নারীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত অনিন্দ্য ও আরো কিছু করার স্বপ্নকে সঙ্গী করে তিনি এগিয়ে যাবেন বহুদূর।

বগুড়ার নায়েব আলী

চরম হতাশা ও দুর্ভোগের পরেও শ্রম, মেধা ও সামান্য পুঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব এটা প্রমাণ করেছেন বগুড়ার যুবক নায়ের আলী। জমিজমা বেচে আর ঋণ করে ভাগ্য ফেরাতে বিদেশ গিয়ে আদম ব্যাপারির প্রতারণায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন তিনি। বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলার হরিহারা গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে ২৭ বছরের যুবক নায়েব আলী গ্রামের সমিতি থেকে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে বিদেশ গিয়েছিলেন। সবকিছু হারিয়ে যখন নিঃস্ব তখনই আবার নতুন করে বেঁচে থাকার আশা জাগে তার মনে। সামান্য লেখাপড়া জানা নায়ের আলী ধৈর্য ধরে নিজ বুদ্ধিকে সম্বল করে দেশেই কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন। তার এ সিদ্ধান্তে হাত বাড়িয়ে দেন পরিবারের সদস্যরা ও তার বন্ধু মিজানুর রহমান। হরিহারা গ্রামের বেশিরভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে প্রচুর পুকুর ও খালবিল। এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এ উপাদানটির কথা মাথায় রেখে নায়েব আলী পরিকল্পনা নেন হাঁস পালনের। পাশের গ্রাম থেকে কিনে আনেন ৩০টি হাঁসের বাচ্চা। মাত্র এক হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে ২০০৯ সালে তিনি নিজ গ্রামে গড়ে তোলেন হাঁসের খামার। বিদেশ যাবার নামে টাকা খোয়া যাওয়া নায়েব আলীর এ কাজ দেখে গ্রামের অনেকেই হাসি-তামাশা করলেও দৃঢ় মনোবল নিয়ে ছয় মাসের মধ্যেই তিনি একজন আদর্শ হাঁস খামারি হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যান এলাকায়। প্রতিটি মুহূর্ত খামারের কাজে লাগিয়ে অভাবকে জয় করেন তিনি। শুধু তাই নয়, হাঁস পালন করেও যে স্বাবলম্বী হওয়া যায় অল্প দিনেই বুঝিয়ে দেন সবাইকে। এভাবে স্বাবলম্বী হওয়া নায়েব আলী এলাকার হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবকদের জন্য কেবল অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত নন, তাদের আশার আলোও। বর্তমানে তিনি এক হাজার হাঁসের খামারের মালিক। অনুকূল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক খাবারের সহজলভ্যতার জন্য হাঁসগুলো বেশী ডিম দেয়। দু'বছর আগে বিদেশ যাওয়ার জন্য যে অর্থ ঋণ করেছিলেন, খামারের আয় থেকে সে অর্থ পরিশোধ করে দিয়েছেন এবং কিছু জায়গা-জমিও কিনেছেন। খামারের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় দু'জন কর্মচারী রেখেছেন খামার দেখাশুনার জন্য। এছাড়া হাঁসের খামার গড়ে উঠার কারণে খাদ্য, শামুক ও হাঁসের ডিম বিক্রির মাধ্যমে আরো ১০ জনের কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি হয়েছে। তার দেখাদেখি এ অঞ্চলে অনেকগুলো হাঁসের খামার গড়ে উঠেছে। নায়েব আলীর স্বপ্ন আগামীতে হরিহারা গ্রামের প্রতিটি বেকার যুবক হাঁস-মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সারা দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ সৃষ্টি করবে।

কর্মপত্র–৩ : সফল উদ্যোক্তার যেগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য চারজন ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত কর

শাহিদা বেগম	আবুল কালাম আজাদ
• • • • •	• • • • •
লুৎফা সানজিদা	**নায়েব আলী**
• • • • •	• • • • •

ীয় পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তাদের উপর প্রতিবেদন তৈরি (Preparing Report on Successful ntropreneurs at Local level)

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তাগণের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা দেশের হাজারো ব্যবসায় বা শিল্প উদ্যোক্তা সামান্য ব্যবসায় দিয়ে জীবন শুরু করে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে একসময় বড় ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের অনেকের কথা আমরা বিভিন্নভাবে জানতে পারি। অনেকের কথা আমাদের জানা হয় না। নিম্নোক্ত প্রতিবেদন ছকের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তাদের উপর প্রতিবেদন তৈরি করে বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে এবং বিষয় শিক্ষকের সহায়তায় সুবিধামতো সময়ে তাদেরকে ব্যবসায় উদ্যোগ ক্লাসে এনে সফলতার কাহিনী শুনতে হবে যাতে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হতে পারি।

প্রতিবেদন তৈরির ছক

উদ্যোক্তার নাম ও ঠিকানা :
ব্যবসায় শুরু করার পটভূমি : (কীভাবে ব্যবসায় শুরু করেন, তার প্রেরণা কে ছিল, কী কী বাঁধা মোকাবেলা করতে হয়েছে)
প্রথম ব্যবসায় :
প্রাথমিক মূলধন :
গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানের তালিকা (গঠনের বছর অনুসারে)
সাফল্য লাভের কারণ :
সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিবরণ :
আগামীদিনের উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য পরামর্শ :

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। "বেঙ্গাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি:" -এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক. জহুরুল ইসলাম
খ. স্যামসন এইচ চৌধুরী
গ. আবুল কালাম আজাদ
ঘ. লুৎফা সানজিদা।

২। উদ্যোগ কী?

ক. কোনো কাজ শুরু করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা
খ. ব্যবসায় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ
গ. পণ্য বাজারজাতকরণের কার্যক্রম
ঘ. ব্যবসার জন্য অর্থ সংস্থান

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব সাদমান একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। শিক্ষার হার বাড়ানোর লক্ষ্যে তিনি নিজ গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। উক্ত বিদ্যালয়ে ৫০ জন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। এতে তার সুনাম বৃদ্ধি হয়।

৩। কোন ধরনের দায়বদ্ধতা থেকে জনাব সাদমান বিদ্যালয় স্থাপন করেন?

ক. সামাজিক
খ. রাষ্ট্রীয়
গ. ব্যক্তিগত
ঘ. পারিবারিক

৪। দেশকে এগিয়ে নিতে জনাব সাদমানের মতো উদ্যোক্তারা ভূমিকা রাখেন–

i. কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে
ii. জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে
iii. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। এম. কম পাস করার পর জনাব ইশরাক একটি ঔষধ কোম্পানিতে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেন। চাকরির নিয়ম কানুন, অন্যের অধীনে কাজ করা ইত্যাদি ভালো না লাগায় চাকরি ছেড়ে নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি ঔষধের ব্যবসায় শুরু করেন। পরবর্তীতে পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা ইত্যাদি পুঁজি করে "রাজ ফার্মা" নামে একটি ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. "স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস"-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. ঝুঁকি বলতে কী বুঝায়? বর্ণনা কর।

গ. উদ্যোক্তার কোন গুণটি ইশরাককে উদ্যোক্তা হতে সাহায্য করেছে? বর্ণনা কর।

ঘ. "রাজ ফার্মা" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইশরাকের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। মূল্যায়ন কর।

২। কালিকচ্ছ গ্রামের শ্যামল সামান্য টং দোকান দিয়ে ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। দিন-রাত খেটে তিলে তিলে তিনি ব্যবসায়টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সদা হাস্যময় শ্যামল কখনো ক্লান্তির কাছে হার মানেননি। তার প্রতিদিনের কাজের ব্যস্ততা এলাকার সবাইকে মুগ্ধ করত। আজ তিনি এলাকার স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তার হাত প্রসারিত।

ক. ইস্টার্ন হাউজিং কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ. বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলতে কী বোঝায়-ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্যোক্তার কোন গুণটি থাকায় শ্যামল আজ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী-বিশ্লেষণ কর।

ঘ. 'ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ উদ্যোক্তার একটি বড় গুণ' উদ্দীপকের আলোকে—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত